

Vol. 33 | No. 1 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নোয়াখালীর লোক-সাহিত্যে জোক-জীবনের পরিচয়

Volume	33
Issue	1
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	খালেদ মাসুকে রসুল
Published online	October 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v33i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i1.6
Pages	123-167
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নোয়াখালীর লোক-সাহিত্যে লোক-জীবনের রূপায়ণ

খালেদ মাসুকে রসুল

নোয়াখালীর লোক-সংস্কৃতি বাংলার অখণ্ড সংস্কৃতির অংশ হলেও এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। নোয়াখালীর লোক-গীতি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবচন, কিংবদন্তী প্রভৃতি সেই লোকচরিত্রের উপর যে ছায়া ফেলেছে তার স্বরূপ আলাদা; বাংলার অন্য কোনো অঞ্চলের লোক চরিত্রের উপর ঠিক অনুরূপ ছায়া পড়েনি। যুগে যুগে এই নদী বিধ্বস্ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত জনসমষ্টির চারিত্রিক বিবর্তনের ইতিহাস এসব জিনিসের প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নেই। পল্লীকবির অমার্জিত ভাষায়, প্রবাদ-প্রবচনে এখানকার লোক-চরিত্রের পরিচয় বিধৃত হয়ে রয়েছে। অতীতে এই পরিচয় বিদগ্ধজনের সম্মুখে তুলে ধরবার কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। এই সমস্যা-সংকুল জেলা চিরদিন শাসন-কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা ও অবহেলার আড়ালে নিজের দুঃখ-দৈন্য, হতাশা ও বেদনার মধ্যে গুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তি-লগ্নে, জাগরণের ও আত্মোপলব্ধির এ নবীন উষায় নোয়াখালীর লোক-চরিত্রের পরিচয়, সত্যিকার অনুসন্ধিৎসুর আগ্রহ নিয়ে তুলে ধরবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের লোক-চরিত্রের সার্বিক পরিচয়ের সঙ্গে নোয়াখালীর লোক-চরিত্রের পরিচয় সঠিকভাবে গ্রথিত না হলে জাতি হিসেবে আমাদের পুরোপুরি পরিচয় পরিস্ফুট হবে না।

বাইরে থেকে নোয়াখালীর লোক-জীবন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয়। নোয়াখালীর মাটি ও জল-বায়ুর সাথে যে পরিচয় ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, যাঁরা নোয়াখালীর মানুষকে এ ক্ষুদ্র ব-দ্বীপের মধ্যে নিবিড়-ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয় তাদেরকে মনের কোণে স্থান দিতে বাধ্য হবেন।

অতি প্রাচীনকাল থেকে নোয়াখালীতে লোক-জীবনের যে ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা সহজ, সরল, সাধারণ ও অনাড়ম্বর।

বাইরের লবণাক্ত পানি এসে এ ধারার পানিকে অপেয় করবার অবকাশ পায়নি. আধুনিক সভ্যতার রকমারী চমক এখানকার অনাড়ম্বর জীবনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেনি, এখানকার মানুষ জীবনের সহজ সরল পথকে আজও আধুনিক করতে যেয়ে অনাবশ্যক কন্টকিত করে তোলেনি। এক কথায়, এখানকার জীবন এখনো পুরোপুরি আদিমতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

নোয়াখালীতে জনসংখ্যার পরিমাণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। সে গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে তার অর্থনীতি বহুদিন আগেই পর্যুদস্ত ও পরাজিত হয়েছে। অথচ এ কৃষিভিত্তিক ছোট জেলাটির ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ নিতান্ত কম। কাজেই এখানকার বিপুলসংখ্যক মানুষ ভূমিহীন কৃষক। পরের জমিতে দিন-মজুরী খেটে কিংবা বর্গাচাষের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। দু'বছর আগেও এখানকার ভূমিহীন পরিবারের হাজার হাজার লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে।

দেশে খাদ্যের সংস্থান নেই বলেই নোয়াখালীর মানুষ অল্পবয়সে ঘর ছেড়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ে। বিদেশে গিয়ে অনেকে হয়তো ভাগ্য গড়তে পারে, অনেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলেয়ার পেছনে ঘুরে ঘুরে একদিন কবরের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে স্বস্তি লাভ করে। বিদেশে ভাগ্যের অন্বেষণে যারা ঘুরে বেড়ায় কেউ নাবিক, কেউ শ্রমিক, আবার কেউবা কারিগর। তাদের জীবনসংগ্রাম যত রক্তাক্তই হোক না কেন, ঘরের কথা তারা ভুলে থাকতে পারে না। মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে তারা পরিবার-পরিজনের জীবনকে সুস্থ ও সচ্ছল করে তুলতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। তারা নিজেদের সীমিত সাধ্যের দোহাই দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা রোজগার করে তা অপব্যয় করে না, মাসান্তে অর্জিত অর্থ নিজে না খেয়েও প্রিয়জনের জন্যে বাড়িতে পাঠিয়ে অনাবিল তৃপ্তি লাভ করে। যদি কখনো বাড়ি আসবার সুযোগ হয়, শহরের বিলাস-দ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী নিজের সীমিত সামর্থ্যের অনুপাতে প্রিয়জনের জন্যে বহন করে নিয়ে আসে।

জীবিকার সন্ধানে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে বিদেশের রীতি-নীতি তাদের জীবনে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রভাব বিস্তার করে।

বিদেশের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ইত্যাদি প্রভাব তারা এড়াতে পারে না। এমন সংস্কৃতির ছাপ দেহ-মনে অঙ্কিত করে তারা বাড়িতে ফেরে, যাতে অজ্ঞ আত্মীয়-স্বজন অবাক হয়ে পড়ে, বুদ্ধিজীবীরা বিদ্রূপের হাসি হাসে। কিন্তু তারা যে জগতের বাসিন্দা, সেখানে বুদ্ধিজীবীর মার্জিত রুচির স্থান নেই, নিরন্তর জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়েও মুখের হাসি তাদের ফুরোয় না, তারা সে জগতের সুখী অধিবাসী।

নোয়াখালীর সাধারণ মানুষ কঠোর পরিশ্রমী। বর্ষার অবিরাম বৃষ্টি ধারাকে উপেক্ষা করে জমিতে আউশ ধান কাটে, বিষাক্ত পানিতে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে আমনের চারা রোপন করে। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে জমি চাষ করে আউশের বীজ বপন করে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে নিড়ান দেয়। নোয়াখালীর শ্রমিকেরা দেশ-বিদেশের কল-কারখানায় অমানুষিক পরিশ্রম করে, অতিরিক্ত খেটে পয়সা কামায় এবং সেই রক্তপানি করা পয়সায় প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে।

নোয়াখালীর নারীও উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তবে সীমিত পরিবেশে করতে হয় বলে তাদেরকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় না। তাদের যা কিছু করতে হয় সবই বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে, অন্য দেশের মেয়েদের মতো তারা মাঠের কাজ করে না। সম্ভবতঃ পর্দা প্রথার কড়া-কড়ির দরুনই তারা কদাচিৎ ঘরের বাইরে বের হয়। আধুনিক যুগের হাওয়া সম্প্রতি তাদেরও গায়ে লেগেছে। আজ আর নোয়াখালীর মেয়েরা গৃহকোণে বন্দিনী নয়। তবে এখনো পুরোপুরি সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঘরের বাইরে গেলে বোরকায় আপাদমস্তক আবৃত করেই বের হয়। নোয়াখালীর প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই আজও দু'এক ঘর হিন্দু বাস করে। তাদের মেয়েরা কিন্তু আবহমান কাল থেকেই দল-বেঁধে মেলায় যাচ্ছে, নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আত্মীয় বাড়িতে যাচ্ছে।

নোয়াখালীর মাটি মমতা মাখানো। পশ্চিম বাংলার মাটির মতো নোয়াখালীর মাটি রুক্ষ নয়, কঠিন নয়, কাঁকর মেশানো নয়, একটা অনাবিল আর্দ্রতা ও কোমলতা একানকার মানুষকে আকর্ষণ করে। এ মাটির টান ছিন্ন করে বেশী দিন দূরে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুদূর প্রবাস থেকেও তারা গ্রামের বাড়ির ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়ে ফিরে আসে।

আজও নোয়াখালীর মানুষ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে নিজের জেলার বাইরে যেতে আগ্রহী নয়। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে তারা পুত্র-কন্যার বিয়ে-শাদী জেলার বাইরে কদাচিৎ দিয়ে থাকে।

এ দুরন্ত দুর্বার সংগ্রামী জনতার জীবন তাদের লোক-সাহিত্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হলে লোক-সাহিত্যের নিদর্শনগুলো বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এদিকে আজ পর্যন্ত কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি। কেউ কেউ অন্য জেলা থেকে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করতে এ জেলাতে আসলেও তাঁদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। কারণ নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা তাঁদের পক্ষে দুর-তিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা কোনো জিনিস দরদ দিয়ে আপন জিনিস হিসেবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মতো মনোভাব দেখাতে পারেন না। বরং রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখেন বলে নোয়াখালীর লোক-সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

নোয়াখালীর লোক প্রধানতঃ কৃষিজীবী। এখানকার চাষীজীবনের বৈশিষ্ট্য লোক-সাহিত্যে অকৃপণ ভাবে বিধৃত রয়েছে। লোক-সাহিত্য সংগৃহীত হলে তার ভেতর দিয়ে এখানকার লোক-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো যে কোন বৈদেশিক অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। নোয়াখালীর চাষী, শ্রমিক, নাবিক, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতির নিখুঁত পরিচয় পেতে হলে এই এই লোক-সাহিত্যের মাধ্যমে খুঁজতে হবে।

জীবনসংগ্রামের ভয়াবহ নৃশংসতা নোয়াখালীবাসীকে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশের মাটি হতে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন মানুষের যে পরিচয় বিদেশের অনাত্মীয় পরিবেশে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তার মধ্যে কৃত্রিমতা রয়েছে। অনাত্মীয় পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে যেয়ে নোয়াখালীবাসী কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। নিজের বৈশিষ্ট্য সংগুপ্ত রেখে পরের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে। সেই ধার করা সংস্কৃতির মধ্যে তাদের সার্থক পরিচয় কখনো পরিস্ফুট হয় না। কাজেই এ-জেলার নিজস্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতির মাঝেই নিহিত রয়েছে তাদের সার্থক পরিচয়।

কৃষি

নদীর নিরন্তর ভাঙা-গড়ার দরুণ নোয়াখালীর মাটিতে পলিমাটির প্রাচুর্য রয়েছে। ফলে এ জেলার মাটী অত্যন্ত উর্বর। সেই উর্বরতার বদৌলতে এখানকার মাটিতে সোনা ফলে। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করবার জন্যে সৈকতবর্তী অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক কারণেই নোয়াখালীর অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় না হলেও প্রধানতম উপায় কৃষি। এখানকার কঠোর পরিশ্রমী চাষীরা কোনো জমি অনাবাদী ফেলে রাখেনি। প্রতি ইঞ্চি জমিতে তারা ফসল ফলায় এবং সেই ফসলই তাদের জীবনের প্রধানতম অবলম্বন।

নোয়াখালীর লোক-গীতি, ধাঁধা, লোক-বিশ্বাস, প্রবাদ-প্রবচন, কিংবদন্তি, ছড়া, ডাক ও খনার বচন, লোক-কাহিনী, পালাগান ইত্যাদি লোক-সাহি-সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় কৃষিজীবীর পরিচয় পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়েছে। এখানকার লোক-সাহিত্যে কৃষির বিভিন্ন দিক উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নোয়াখালীর চাষীরা বাংলার অন্য অঞ্চলের মত আজো মান্ধাতার আম-লের লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে। শক্ত কোনো গাছের বাঁকা গুঁড়িকে সূত্র-ধর কেটে-ছেটে লাঙল তৈরী করে। সেই লাঙল দিয়ে মাটি চাষ করে এখানকার কৃষক তার জমিতে সোনার ফসল ফলায়, তার দুর্বহ জীবনের সংস্থান করে। এখানকার ধাঁধায় তাই স্বাভাবিক ভাবেই লাঙল একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই বিশিষ্ট জীবনোপায় সম্পর্কে ধাঁধা :

এক গাছের চেঁম[১]
কাঁদো করি নেঁম[২]
এই ছোলক গা বাঙাই দিতো হাইল্যে
আজার[৩] টেঁয়া দেম ॥

এই ধাঁধায় লাঙল তৈরীর কাঠের উপাদান ও লাঙল কাঁধে নোয়াখালীর চাষীদের চির পরিচিত মূর্তি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে।

এক কালে সোনার বাংলা চিনিতে স্বয়সম্পূর্ণ ছিল। মুসলিম আমলে চিনির জন্যে আমাদেরকে কখনো বিদেশের দিকে চেয়ে থাকতে হতো না।

ইংরেজ-আমলে সুবিদিত কারণে আমাদের চিনি-শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে আবার এ-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। তখন থেকে আমাদের দেশে আখের চাষ দিন দিন বেড়ে চলেছে। শুধু চিনি উৎপাদন নয়, খাদ্য হিসেবেও আঁখ বেশ সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। তাই এখানকার তৌহিদবাদী মুসলমান ধাঁধায় আখের পরিচয় দিতে যেয়ে আল্লাহ্‌র মহিমার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে :

খোদার কি কুদরুত্,
লাডির ভিত্‌রে শরবত্ ।।

আনারস বাংলাদেশের একটি সুস্বাদু ফল। এই জনপ্রিয় ফল নোয়াখালীতে খুব বেশী উৎপাদিত হয় না, তবে সিলেটের আনারস এ জেলায় প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয় এবং নোয়াখালীর মানুষ আনারসের উপাদেয় রসের স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করে। স্থানীয় ধাঁধায় এ ফলটির আকর্ষণীয় চেহারা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

হেট[৪] আছে উজুড়ি[৫] নাই
চোখ আছে নাক নাই।

অথবা

উত্তুরেতুন আইয়েরে বুড়ি
জুব্বা-জাব্বা লই,
হেই বুড়িয়ে দরবার করে
মাইজ খাডালো বই[৬] ।।

এখানে 'উত্তরেতুন' শব্দটি তাৎপর্যময়। আনারস নোয়াখালীর উত্তরে অবস্থিত সিলেট জেলা থেকে আমদানী হয়, এ শব্দটি সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

আনারসের মতো কলাও বাংলাদেশের নিজস্ব ফল নয়। সম্ভবতঃ আরবরাই এই ফল আমাদের দেশে আমদানি করেছে। কলাগাছ ও তার ফসল ফলনের বৈশিষ্ট্য নোয়াখালীর ধাঁধায় চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে :

মা রইছে[৭] নানীর হেডে
আঁইচ[৮] গেছি বাবুর আঁডে।।

অথবা

গরের হিছের[৯] গাই[১০]
এক বিয়ানে নাই ।।

নোয়াখালীর মুসলমান আজও এ জনপ্রিয় ফলটির নামের মৌল উচচারণ অব্যাহত রেখেছে কলার পরিবর্তে 'কেলা' উচচারণ করে।

নোয়াখালীতে লোক-লৌকিকতার অপরিহার্য অঙ্গ পান। নিতান্ত গরীবের ঘরেও গৃহস্থ এখানে অতিথিকে পান খাইয়ে আপ্যায়িত করে। এই পান সাজ্‌বার ও পানের অন্যতম উপাদান সুপারি কাটবার বিচিত্র কৌশল নোয়াখালীর মেয়েরা আয়ত্ত করেছে। তাদের হাতের সযত্নে সাজানো পান খেয়ে মেহমান মাত্রই পরিতৃপ্তি লাভ করে। পান গৃহস্থের ইজ্জত বা সম্ভ্রম রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। অভ্যাগতকে পান দিয়ে সমাদর করতে না পারলে গৃহস্থ 'মরমে মরিয়া যায়'। নোয়াখালীর ধাঁধায় পান তাই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে:

কোন গাছের হাতা[১১]
ইজ্জতের মা ।।

অন্যান্য জেলার মতো নোয়াখালীতেও তরকারি রান্নার অন্যতম উপাদান হলুদ। হালুদ ছাড়া কোন তরকারি রান্না করা সম্ভব নয়। রান্নার এই জনপ্রিয় উপাদান তাই স্বাভাবিকভাবেই নোয়াখালীর ধাঁধায় স্থান পেয়েছে:

উপরে মাডি[১২] নীচে মাডি
মদ্যে বেডি[১৩] সুন্দরী।

এখানে হলুদের রঙ যে। সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়তা করে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

নোয়াখালীতে কলের লাঙল এখনো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এখানকার চাষীরা আজও এক জোড়া গরুর পেছনে শক্ত করে লাঙল ধরে গরুর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে জমি চাষ করে, এ চিরন্তন ছবি নিম্নের ধাঁধায় মূর্ত হয়ে উঠছে:

আঁডে[১৪] কুরকুর ছুঁড়ে মাডি
ছ' চোখ তিন হুগুডি[১৫] ।।

বিয়ের সময় নওশা যখন মেয়ে মহলে যায় তখন মেয়েরা নানা রকমের ধাঁধার দ্বারা নওশাকে নাজেহাল করতে চায়। এ-প্রথা আজও পল্লী-অঞ্চলে

অল্প-বিস্তর প্রচলিত রয়েছে। নিম্নে মেয়ে মহলে বহুল প্রচারিত একটা ধাঁধা ও প্রত্যুত্তর উৎবৃত করা হলো। নোয়াখালীতে পান যেমন মজলিস গুলজাররে একটা অপরিহার্য অঙ্গ, পানের চাষও তেমনি জনপ্রিয় কৃষি কাজ। পান চাষ সম্পর্কিত এ ধাঁধাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। শালী বা ভ্রাতৃবধূ জাতীয় কোনো চতুরা মেয়ে বরকে প্রশ্ন করে :

হাঁন খাঅ হোণ্ডিত বাই[১৬]
কতা কঅ ঠারে
হান-গুঁয়া হয়দা[১৭] অইলো
কোন অবতারে ?
যে কইতো হারে হাঁন গুয়ার
জন্মোর কতা
মোমিন অই চাবাই খাইবো
চন্দনের হাতা,
যে ন' কইতো হারে
হাঁন-গুয়ার জন্মোর কতা
ছাগল অই চাবাই খাইবো
বনোর হার্‌পা হাতা ।।

বর সাধারণতঃ ছাগল হতে চায় না। তাই পূর্বাহ্নেই বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। শ্বশুর বাড়িতে মেয়ে মহলে প্রবেশ করে যে মেয়েদের সযত্নে পরিবেশিত পান খেয়ে ছাগল বনে যায় না, বরং পণ্ডিতের মতো তাদের ধাঁধার উত্তরে বলে :

হাঁন-গুয়ার হাতা
আছিলো হাতালের[১৮] নিচে
হনুমানে তুলি দিছে
বিবি হনুবার কাছে
বিবি হনুবারা হাত[১৯] বৈন
জমি কৈচেচ হারা[২০]
মৈদ্দে মৈদ্দে রুইছে
হান-গুয়ার চারা

আকি গাছের হাঁকি হাতা
　　দর্মো গাছের লতা
কোন বদ্দর[২১] লোকে
　　জিজ্ঞাস করে
হাঁন-গুয়ার জনমের কতা ?
হঁতের[২২] আড়ে আড়ে
　　কাইচচা চুলে
চামুক দি তোলে
হাঁমুক বাড়া বরি দেন হাঁন
　　খাইবো বেকের[২৩] বিদ্যমান ।।

উত্তর শুনে মেয়ে-মহলে খুশরি তুফান ছুটে। মেয়েরা বরের যোগ্যতায় আস্থা স্থাপন করে। তারা তখন ওজন ঠিক রেখে রঙ্গ-রসিকতা করে। সাবধানতার সাথে বাক্যালাপ না করে বরের কাছে জব্দ হতে চায় না। বলা বাহুল্য এই ধাঁধার প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে ইতিহাসের বিন্দুমাত্র সংশ্রব নেই। মানুষ তাদের দুর্বহ জীবনের বোঝার ভার কথঞ্চিৎ লঘু করবার উদ্দেশ্যেই একটা মনগড়া ইতিহাস তৈরী করে আদি যুগের হনুমানের সাথে কলি-যুগের হনুফা বিবির সম্পর্ক পাতায়। এ সম্পর্ক যতই হাস্যকর হোক না কেন লোক-সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে এর লোক-চরিত্র বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা অনস্বীকার্য।

নোয়াখালীর প্রবাদ-প্রবচনেও স্থানীয় লোক-চরিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। চাষীর জীবন অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। সে দায়িত্ব যারা এড়াতে চায় তাদের পক্ষে চাষী হতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। নোয়াখালীর প্রবাদ-প্রবচন ইঙ্গিতে চাষীর ছেলেকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে বলে :

অইতো[২৪] চায় বৌ
ছুইতো[২৫] চায়না গৌ[২৬]।

এই প্রবচনে যে অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

নোয়াখালীর চাষীরা সাধারণতঃ অশিক্ষিত; কিন্তু ভূয়োদর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের জ্ঞানের পরিধি বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বিশ্বাস,

পুরুষানক্রমে যে যেই ব্যবসা অনুসরণ করে এসেছে তাই তার প্রকৃত জীবন-ধারণের উপায়। তারা বিশ্বাস করে-

আইল্যার[২৭] আল
জাইল্যার[২৮] জাল।।

এই প্রবচনে নিজ নিজ ব্যবসায়ে একনিষ্ঠতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে হাল চাষ করবে তাকে তার হালের প্রতি সর্বাধিক মনো-যোগ দিতে হবে। অনুরূপভাবে জেলেকে দিতে হবে তার জালের দিকে।

কৃষি কাজে সময়ের গুরুত্ব অত্যধিক। যখন যে কাজ প্রয়োজন তা ঠিক সময় না করলে চাষীর জীবন বিড়ম্বিত হয়। কখন বীজ বুনতে হবে, জমিতে চাষ দিতে হবে, নিড়ান দিতে হবে, আইল বাঁধতে হবে তা কৃষি-জীবীদের নখদর্পনে। সময়মত কাজ করলে চাষীদের কোনো বিপদে পড়তে হয় না। তাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ বলে :

আগেতাই[২৯] বাঁদে[৩০] আইল
তই খায় নানান হাইল[৩১] ।।

সময় থাকতে কাজ করলে নানাবিধ ফসলে কৃষকের ঘর ভরে যায়, তার অভাব অভিযোগ দূরীভূত হয়।

অনেক সময় পিতৃপুরুষের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করতে যেয়ে অনেক কৃষক দুর্গতি ভোগ করে। পিতা হয়তো অলস জীবন যাপন করে, টাকা-পয়সার অপব্যয় করে জোত-জমি বিক্রি করে আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়ে গিয়েছে। সন্তান যদি পিতার দুর্ভোগ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে তবে তার অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। অনেক নবীন চাষাই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের সর্বনাশ করে, পরিবার-পরিজনকে দুর্দশায় ডুবিয়ে দেয়। এদের হাল-হকিকত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনেকে নিজ নিজ সন্তানদের বলে :

আগের আল যেম্‌নে যায়
হিঁছের[৩২] কালও হেমনে যায় ।।

পূর্বপুরুষের অনুসৃত রীতি অনুসরণ করে উত্তরপুরুষ। পূর্বপুরুষের রীতি যদি ভ্রান্ত হয় তবে উত্তরপুরুষের দুর্গতির অন্ত থাকে না। আবার পূর্বপুরুষ

যে পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে সুখী সংসার গড়ে তুলেছে উত্তরপুরুষ সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষিজীবী হিসেবে সাফল্য লাভ করতে পারে।

নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীদের মধ্যে এমন অনেক চাষী আছে যারা অন্যের নিন্দায় পঞ্চমুখ। অথচ নিজেদের এক কানা-কড়ির মুরোদও নেই। কে কোথায় ভুল করে পাটের জমিতে ধান বুনেছে, কে মওসুমের প্রথমেই বীজ বুনে সর্বনাশ করেছে, এমন সব পরচর্চা করে কাটায়, অথচ তাদের নিজেদের লাঙল-জমির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এরা সত্যিকার নিরীহ চাষীদের উত্যক্ত করে, তাদের শান্তির নীড়ে আগুন দিতে চেষ্টা করে। এসব অকর্মণ্য, ছিদ্রান্বেষীদের সম্পর্কে প্রবাদ বলে :

আল্যো[৩৩] আঁডেনা[৩৪] বলদ
গুঁতা মারণের শনি ॥

নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে কেউ কাউকে দোয়া করতে হলেও চাষের উন্নতি-কেই প্রাধান্য দেয়। তারা বলে :

তেঁমার খেঁতে[৩৫] হুতে[৩৬] বাড়ুক।

এই ভাঙা-গড়ার দেশের মানুষ, ঝড়-তুফানে নিরন্তর বিপর্যস্ত জনসমষ্টি, প্রকৃতির সাথে নিরন্তর সংগ্রামে দুঃসাহসী মানুষ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে :

জল জল বাসা[৩৭]
হোদ্দলার[৩৮] মৈদ্যে চাষা ॥

নোয়াখালীর লোক-বিশ্বাসে লোক-চরিত্রের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তারা তাদের বিশ্বাসকে কৃষি কাজের সীমানায় অনেকখানি সীমিত রেখেছে। অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর এখানকার লোক-বিশ্বাসের ইমারত গড়ে উঠেছে। কলাগাছের বংশবৃদ্ধি সম্পর্কে জনপ্রিয় বিশ্বাস—

যেই কেলা গাছের যতুগা[৩৯] কানা অয়
হেই কেলা গাছের ততুগুণ হোল[৪০] অয় ॥

এই বিশ্বাসের মধ্যে সত্য নিহিত রয়েছে কিনা তা কেউ পরীক্ষা করে দেখেনি। কিন্তু বাস্তবের সংঘাতে সরল বিশ্বাসী কৃষকের বিশ্বাসের ভিত বিন্দুমাত্র টলে না। পুরুষানুক্রমে তারা এ বিশ্বাস পোষণ করে আসছে।

গৃহস্থের ক্ষেতের ধান কাটা যখন শেষ হয় তখন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস তার বুক চিরে বের হয়, পাড়া-প্রতিবেশীরা আশা করে মিষ্টান্নের। তাই এখানকার চিরন্তন বিশ্বাস :

দানি[৪১] উডলে গিরস্তে শিন্নি ন্য খাবাইলে
হরের বোছর জমিতে দান[৪২] কম অয়।।

পরের বছর ক্ষেতের ধান পরিমাণে কম হয় কি না তা বুঝবার উপায় নেই। কারণ এখানকার কোনো কৃষক এ লোক-বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করেনি।

গরু গৃহস্থের শাশ্বত সম্পদ। এই পরম সম্পদের নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় গৃহস্থের নখ-দর্পনে। সুলক্ষণ ও কুলক্ষণযুক্ত গরু দেখলেই তারা চিনতে পারে। এমনি এক সুলক্ষণযুক্ত গরু, যে গরুর দাঁত সাতটি। এমন গরু সম্বন্ধে জনগণ বিশ্বাস করে :

হাত্‌গা[৪৩] জাঁত আলা গরু বাইত[৪৪]
থাকলে গিরস্তের দুক[৪৫] ছাড়ে।।

গৃহস্থের দুঃখ ছাড়ে কি ছাড়ে না সে কথা বড় নয়; বড় কথা, নোয়াখালীর চাষীরা এ চিরন্তন বিশ্বাস কখনো ছাড়ে না।

নোয়াখালীর কৃষিজীবীরা নিজেদের পেশায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তা উপেক্ষণীয় নয়। তারা গাছ দেখে ফলের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। কিভাবে বীজ বুনলে ভাল ফসল হয়, চাষের কাজে নিত্যদিনের সঙ্গী গরুর গায়ের উকুন কিভাবে দূর করা যেতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব বিশ্বাস পোষণ করে। যেমন :

ক. দুগা কদু গাছ এত্তরে উজান মুঁই[৪৬] বাইলে কদু বেশী দরে[৪৭]।
খ. খেঁতের[৪৮] মাইজকানতুন বাঁইন[৪৯] শুরু কৈল্যে হসল[৫০] বালা অয়।
গ. শনি-মোঙ্গল বারে হক্কুনের আঁডিড[৫১] সুরুজ ডুবুনের আগ
গরুর গাত বাঁইনলে[৫২] গরুর গার উঁন[৫৩] মরে।।

নোয়াখালীর লোক-জীবনে লোক-সাহিত্যের অন্যতম অংশ ছড়ার প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এ ছড়ার

ছড়াছড়ি। তারা কৃষি সম্পর্কেও ছড়া আওড়ায় এবং বুড়োরাও তাদের ছড়া শুনে আমোদ উপভোগ করে। নোয়াখালীর শিশুরা হাত-তালি দিতে দিতে মরিচ ক্ষেত নিড়ানীতে নিয়োজিত পিতামহকে লক্ষ্য করে বলে :

দাদা বুড়ইয়াতে[৫৪]
মরিছ কোবায় দুই আতে
হাঙগার[৫৫] কতা মনো উডলে
মরিচ কোবায় তিন আতে ।।

ছড়ার বিশেষ কোনো অর্থ নেই। অর্থহীন কথার ফুলঝুরিতে শিশুরা নিজেরা আনন্দ পায়, অপরকেও আনন্দ দিতে চেষ্টা করে। চাষিদের ছেলে-মেয়ে বলে তাদের ছড়ায় থাকে গরু, কলাগাছ ইত্যাদি সুপরিচিত কৃষি-সম্পর্কিত জীব ও গাছের উল্লেখ। তারা সুর করে গায় :

ছরোতা ছরোতা কি ছরোতা
গরু মরে গাঁসে
কুমারিয়ার ডাকে
কেলার ছড়া হাকে
কেলা খায় বাদুরে
মা বোলায় যাদুরে[৫৬]
আব্বাজান, আব্বাজান
আঁরে কদ্দুর জিরাপি
জিরাপি খাইতে মিষ্ট লাগে
হৈসা[৫৭] দিতে কষ্ট শ লাগে ।।

অতি শৈশবেই এখানকার ছেলে-মেয়েরা আলুর ছড়া, কচুর ছড়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে শীতকালের শেষের দিকে ছোট ছোট কোদাল দিয়ে এ সব ছড়া সংগ্রহ করে। কচুর ছড়া তরকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আলুর ছড়া ছেলে-মেয়েরা পুড়ে বেশ তৃপ্তির সাথে খেয়ে আনন্দ পায়। তারা তাদের ছড়ায় এ-সব প্রিয় জিনিসের কথা ভোলে না। তারা ছড়ায় বলে :

আলুর ছড়া কচুর ছড়া
মামুর বিয়া দুদের গোঁড়া

মামীয়ে কাডে রঙের হুঁতা
মামু রাঁদ্দে বাত
ও মামী কাঁইনজো[৫৮] না-
মামু[৫৯] তোঁর[৬০] বাপ ।।

বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসে যখন গ্রামাঞ্চলে বিবিধ ফল পাকতে থাকে। তখন শিশুদের মহলে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। তখন তাদের মুখে মুখে ছড়া শোনা যায়। সে সব ছড়া অর্থহীন হলেও অপরিসীম আনন্দের দোতক। এ সব ছড়া কেউ লিখে বা রচনা করে দেয় না। কৃষিজীবীদের ক্ষেতের ফসলের মতো, প্রকৃতির বুকে গাছ-পালার মতো, প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া শিশুদের মনে এ-সব ছড়া আপনা-আপনি জন্মে। তারা আনন্দের স্রোতে ভেসে যায় :

আম হায়[৬১] জাম হায়
হায় দূত্রা,
বুড়ী কালে হাদি[৬২] অইছে
যাইতো মতুরা[৬৩] ।।

অথবা

আম গাছো জাম দরে
তেঁতি গাছো তাল রে
কলি কাইল্যা[৬৪] রঙ দেই
ডরে হিম্‌সিম্‌ রে ।।

নোয়াখালীর লোক-চরিত্রের পরিচয় প্রচুর পরিমাণে বিধৃত রয়েছে এখানকার লোক-গীতিতে। রাখাল ছেলেরা এ-সব গান গেয়ে পল্লীমুখরিত করে তোলে। চাষী-গৃহস্তের নিত্য ব্যবহার্য ও উৎপাদিত জিনিসপত্রই এ-সব গানের বিষয়বস্তু। নোয়াখালীর ভাষায়, চাষীদের নিজস্ব সুরে এ-সব সঙ্গীত যখন গীত হয় তখন পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে একটা মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। হয়তো রাখাল বালক দুধের গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে। যেতে যেতে তার কণ্ঠ থেকে স্বতঃই উৎসারিত হচ্ছে :

মিয়ার দলা[৬৫] গাই নারা[৬৬] খাই
ছৈলছেয়ে[৬৭] ডেউয়াই,
মিয়ার দলা গাই...

নোয়াখালীর কৃষাণীদের মুখেও সুরের মায়া আছে। তাদের নিজস্ব জগতে ও পরিবেশে তারা নিজেদের শিল্পসম্মত করে গান গায়। সে গানে চাষী গৃহস্থের অন্তঃপুরের ছবি মূর্ত হয়ে উঠে। রাতের অবসানে পূর্বাকাশে যখন সোবেহ্-সাদেকের রূপালী রেখা ভেসে উঠে, তখন বাড়ীর গিন্নি গানের সুরে আদেশ জারী করেন :

রাইত হোয়াইছে রাইত হোয়াইছে
　　কুরউয়ায় দিছে ডাক
বড় বোরে ছেলাই[৬৮] দে
　　হাঁনি আইনতো যাক।
রাইত হোয়াইছে, রাইত হোয়াইছে,
　　কুরউয়ায় দিছে ডাক
মাইজ্জা বোরে ছেলাই দে
　　গোবর হালাইতো যাক।
রাইত হোয়াইছে রাইত হোয়াইছে
　　কুরউয়ায় দিছে ডাক
ছোড বোরে ছেলাই দে
　　উডান[৬৯] কুড়াইতো[৭০] যাক।

এ-ধরনের মেয়েলী গানে চাষী গৃহস্থবাড়ীর প্রভাতকালীন কর্মব্যস্ততার একটা অনবদ্য ছবি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ডাক ও খনার বচন নোয়াখালীর চাষীদের জীবনে সম্ভবতঃ সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। চাষের কাজে তারা ডাক ও খনার বচনকে চিরন্তন সত্য হিসেবে মর্যাদা দেয়। পিতা-পুত্র নির্বিশেষে সকল কর্মক্ষম ব্যক্তি যদি চাষের কাজে সমভাবে অংশ গ্রহণ করে তবে অভাব দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। খনা বলে।—

বায়[৭১] হুতে চাষ করে
দেশ ছাড়ি অবাব[৭২] হরে ॥

আখের চাষে কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। নিঃসঙ্গ কৃষকের পক্ষে আখের চাষ করা সম্ভব হয় না। যেই কৃষকপরিবারে বেশীসংখ্যক

কর্মক্ষম পুরুষ আছে সেই পরিবারই আখের চাষে লাভবান হতে পারে। খনা বলে :

যেতার[৭৩] হাত হুত তেরো নাতি
হেতে করে কুঁইউর[৭৪] খেতি[৭৫] ।।

চাষের নিয়মকানুন কোন স্মরণাতীত কালে খনা বিধিবদ্ধ করে গেছে, আজও নোয়াখালীর কৃষক অপূর্ব নিষ্ঠার সাথে সে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চাষবাস করে। সুদূর অতীত কাল থেকে এ-সব ব্যাপারে একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে। সেই রীতি আজও সমানে চলেছে। খনা বলে :

হোল[৭৬] চাষে মূলা
হিয়ার[৭৭] অর্দোকে তুলা
হিয়ার আর্দোকে দান
বিনা চাষে হাঁন ।।

বিবিধ ফাল-পাকড় ও ক্ষেতের ফসল ফলনের ব্যাপারে একটা অর্থহীন সামঞ্জস্য গড়ে তোলে নোয়াখালীর কৃষক। কোন্ ফলের অত্যধিক ফলন হলে তার পরিণতি কি হবে সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত পূর্বাভাষ দেয়। খনা বলে :

আমের বোছর বান
তেঁতির বোছর দান ।।

যেবার আমের ফলন খুব বেশী হয় সে বছর ঝড় তুফান হয়, বন্যার প্রকোপ বাড়ে। তেঁতুলের ফলন বেশী হলে ধান উৎপাদন বাড়ে। এ-সব বিশ্বাস খনার বদৌলতে নোয়াখালীর কৃষাণদের মনে শিকড় গেড়ে আছে।

নোয়াখালীর নিরক্ষর কৃষক কৃষিবিজ্ঞানের দুরুহ বিষয় আয়ত্ত করেছে। জমির উর্বরতা ও উষরতা সম্পর্কে তাদের মুখ দিয়ে খনা বলে :

বাদি তলে লোনা
মাঁদার তলে সোনা ।।

বাদি গাছের প্রভাবে তলার মাটি লবণাক্ত হয়ে যায়। সেখানে কোনো ফসল হয় না। কিন্তু মাদার গাছের তলার মাটি বেশ উর্বরতা প্রাপ্ত হয়। সেজন্য নোয়াখালীর সুপারীর বাগানে অজস্র মাদার গাছ রোপন করা হয়।

নোয়াখালীর কৃষাণের জীবনে অলসতার স্থান নেই। হাল-গরু থাকা সত্ত্বেও যে চাষা পরিশ্রম করে চাষাবাদ করতে চায় না, তার দুর্গতি কখনো ঘোচে না। খনা বলে :

আছে গরু না ছুয়[৭৮] আল[৭৯]
হেতার দুক হগল[৮০] কাল ।।

কৃষক পল্লীতে গরু-ছাগল প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রতিপালিত হয়। ফসলের উপর এদের উপদ্রব কোনো কোনো সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। এখানকার মানুষ খনার দোহাই দিয়ে বিশ্বাস করে ছাগল যদি কোনো চারা গাছ খায় তবে সেই গাছ আর কখনো বাড়ে না। এজন্য গরু ছাগল সাবধানে রাখবার জন্যে সতর্ক করে দিয়ে খনা বলে :

গরু-ছাগলের মুয়ে[৮১] বিষ
চারা রুই রাঅন[৮২] দিস ।।

কোন গাছ কি ভাবে রোপণ করতে হবে, কি ভাবে সে গাছের পরিচর্যা করতে হবে, সে সম্পর্কে আমাদের কৃষকেরা পুরোপুরি ওয়াকেবহাল। তাদের হয়ে খনা বলে :

কেলা গাছ রুই ন্য কাডন হাত[৮৩]
তাতেই কা'ড় তাতেই বাত[৮৪] ।।

কলা গাছ রোপণ করে, সে গাছের পাতা কেটে যদি গাছকে দুর্বল করে ফেলা না হয়, তবে সেই গাছে যে কলা ফলে তা দিয়ে চাষীর ভাত-কাপড়ের অভাব দূর হয়। কলা গাছের পাতা কাটা সম্পর্কে খনার বচনের সত্যতা আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানও স্বীকার করে।

কৃষি বিষয়ক কিংবদন্তী ও কিস্‌সা কাহিনীর অভাব নোয়াখালীতে নেই। বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর কিস্‌সা কাহিনী কিংবদন্তীতে নোয়াখালীর লোক-

চরিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আমিশাপাড়ার বারাহী দেবী, আমানতপুরের কমলার দিঘি, রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী, ইছা খালী, বামনী ও বজরা নামের উৎপত্তি, বিভিন্ন স্থানের দিঘি, পুষ্করিণী, সেতু, খাল সম্পর্কে অজস্র কিংবদন্তী আছে। এ-সব কিংবদন্তীর অনেকগুলির সঙ্গে কৃষি কাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অধিকাংশ কৃষক পরিবারে কিংবদন্তীগুলো দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা হয়।

ঝাড়-ফুকের মধ্যেও নোয়াখালীর কৃষক জীবনের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এখানকার মেয়েরা পারস্পরিক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে একে অন্যের তৈরী পিঠা নষ্ট করে। এ জন্যে যে মন্ত্র তারা ব্যবহার করে তার মধ্যেও কৃষি-জাত দ্রব্য স্থান পেয়েছে। পিঠা নষ্টের মন্ত্রে আছে :

কেলা গাছো মাইল্যাম[৮৫] ঠেলা
কাঁই[৮৬] অইলো দলা দলা
গাঁড়ার[৮৭] আগাততুন মাইল্যাম ডাক
খোলার হিড়া খোলাত থাক ॥

নোয়াখালীর পালাগান লোক-চরিত্র চিত্রণ উপলক্ষে কৃষিক্ষেত, ধান-ক্ষেতের চিরন্তন পাখী, কৃষিজাত দধি, চিড়া, কলা, ধান প্রভৃতিও চিত্রিত হয়েছে। নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ পালাগান 'চৌধুরীর লড়াই' গীতে কবি গেয়েছেন :

টাঙন দৌড়াই মহারাজ করিছে গমন
করিমপুর পাথরে যাই দিল দরশন ॥
করিমপুর পাথরে যাই কোন কাম করিল
ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালাম শিকার করিল ॥
করিমপুর পাথরে কালামে ধান খায়
লাকে ২ কালাম ধরি চৌধুরী বাড়ীতে পাঠায়।
[মাহাম্মদ ফরিদ, 'চোধুরীর লড়াই', পৃ. ২৮]

রূপসিং পাথরে যাই চান্দ নজর করি চায়
দধির চিড়ার বোঝা নড় বাড়িতে যায় ॥
['চৌধুরীর লড়াই', পৃ. ৭৪]

এই মতে চান্দা বির কোন কর্ম করিল,
আল্লা চাউল কুলাপিত কলা খরিদ করিল।।
['চৌধুরীর লড়াই', পৃ. ৩৬]

বাগানীরে কাটে যেন বাগানের কলা,
সে মত ইংরেজ সৈন্য চান্দে কৈল্য খোলা।।
['চৌধুরীর লড়াই', পৃ. ৩৯]

বাশ বনে আগুন দিলে গিরা ফুটি যায়।
সে মত অর্জন লৈল চান্দা বীরের গায়।
['চৌধুরীর লড়াই', পৃ. ৪৪]

শিল্প

নোয়াখালীর শিল্পে স্থানীয় লোক-জীবনের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। এখানকার শিল্পীরা নিজেদের শিল্পকর্মে নিজ নিজ সংস্কৃতিবোধ ও রুচিজ্ঞান বিধৃত করে রাখে। আবহমান কাল থেকে এ-সব শিল্পী নোয়াখালীর আঞ্চলিক জীবনে বৈচিত্র্য ও সুখ-সমৃদ্ধি সরবরাহ করে আসছে। নোয়াখালীর শিল্পীদের মধ্যে তাঁতী, কামার, কুমার, [illegible]কার স্বর্ণকারই প্রধান। কুটির শিল্প আর হস্তশিল্পে এ জেলার নারী-পুরুষ একটা সহজাত প্রতিভা নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করে। এখানকার কুটির শিল্পের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে পাটী, পাখা, শিকা, দড়াদড়ি, নক্‌শী কাঁথা ওঁড়ালাই জাতীয় বাঁশের সামগ্রী। বাঁশ দিয়ে এ জেলার শিল্পীরা মাছ ধরার নানা রকম যন্ত্রাদিও তৈরী করে।

এক কালে নোয়াখালীর লবণ-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। স্থানীয় লোকেরা লবণ তৈরী করে অনেকেই জীবিকার সংস্থান করতো এবং তারা পরিচিত হতো মলঙ্গী নামে। আজও নোয়াখালীর কোনো কোনো স্থানে এ-সব মলঙ্গীদের উত্তরপুরুষের সন্ধান মেলে।

নোয়াখালীর আঞ্চলিক ধাঁধার মধ্যেও এখানকার লোক-জীবনের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। নোয়াখালীর গৃহস্থ বাড়ীতে উনুন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই উনুন তৈরীর ব্যাপারে মেয়েরা অদ্ভুত শিল্পজ্ঞানের

পরিচয় প্রদান করে। ধাঁধার মাধ্যমে স্থানীয় লোকেরা এই উনুনকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তারা মজলিসে বা বিয়ে-শাদীতে রহস্যের ধাঁধার মাধ্যমে পরস্পরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে।

এক বুড়ির তিন মাতা[৮৮]
বুড়িয়ে খায় লতা-হাতা[৮৯] ।।

অথবা

উক টান বুক টান
কোন জিনিসের তিন কান ?

নোয়াখালীর গৃহনির্মাণশিল্প বাংলার অন্য যে কোনো জেলার গৃহ-নির্মাণের চেয়ে উন্নততর রুচির পরিচায়ক।

হিছাড়াতে বাগ-বাগিছা সামনে রাঅন হর
বাড়ি বাঁদন খোলা-মেলা দৈন দুয়ারইয়াগর ।।
.. ..
ছনের ছানি বাঁশের গর
বেতের বাদে মজবুত কর।

গান্ধী অনেকদিন নোয়াখালীতে অবস্থান করেছেন। বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি তিনি নাকি বলেছেন, নোয়াখালীর গৃহনির্মাণ শিল্পের মতো শিল্পজ্ঞান এই উপ-মহাদেশের অন্য কোথাও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। এমন সুনিবন্যস্ত বাগান, দরজা, পুকুর-দিঘি তিনি নাকি অন্য কোথাও দেখেননি। এ-সব বাড়ী-ঘর, উঠান-আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দিনে অন্ততঃ দু'বার বাড়ীর মেয়েরা ঝাটা দিয়ে এসব ঝাড় দিয়ে থাকে। এই ঝাটা নোয়াখালীর গ্রাম্য জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সময়ে অসময়ে মেয়েদের দেখা যায় 'ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা'। স্থানীয় ধাঁধার মাধ্যমেও এই ঝাটা অমর হয়ে আছে। ধাঁধায় আছে :

এই গরো[৯০] যায় হেই গরো যায়
দুড়ুম দুড়ুম আছাড় খায় ।।

এক কালে নোয়াখালীর গ্রাম্য জীবনে অবসর বিনোদনের প্রধানতম উপায় ছিল হুকোর সাহায্যে তামাক সেবন করা। এই হুকো অন্য জেলা থেকে

থেকে আমদানী হতো, মেটে হুঁকো তৈরী করতো স্থানীয় কুমোরেরা, অনেকে নারকেলের খোলা দিয়ে তৈরী করতো হুঁকোর খোল। বিড়ি-সিগারেটের প্রাচুর্য এসে হুঁকো এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবে ধাঁধার মাধ্যমে হুঁকো আজও অমর হয়ে আছে। এককালীন গাঁয়ের মজলিসের ও ব্যক্তি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হুকোর পরিচয় দিতে যেয়ে ধাঁধা রচিত হয়েছে :-

নুঁয়ে[৯১] মুঁয়ে কতা কয়
আতো আতো চলে।।

অথবা

লাডির আগত আগুন
তলায় হাঁনি[৯২] ।।

নোয়াখালীর সূত্রধরের শিল্প-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বাংলার অন্যান্য জেলার সূত্রধরদেরই সমগোত্রীয়। তাদের তৈরী ঘর-দরজা, আসবাব-পত্র, এমন কি খড়ম পর্যন্ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এ জেলার মানুষ সকল ঋতুতে বিশেষ করে বর্ষার সময়ে খড়ম ব্যবহার করতো। যে কোন বাড়ীতে গেলে খড়মের খটাখট্ শব্দ শোনা যেত। আজকাল চামড়া ও রবারের স্যান্ডেল এসে খড়মকে গদিচ্যুত্য করলেও নোয়াখালীর ধাঁধায় খড়ম আজও অমর হয়ে রয়েসে।

ইনা শিঁন্ শিনা
　　ইনার মাজা ক্ষীণা
ইঁনা যদি মন করে
আজার[৯৩] মাঁনস[৯৪] হার করে ।।

অথবা

উনি উনি উনি
উনির মা বুনি
উনিএ যদি মন করে
খাড়া মাঁনস হার[৯৫] করে ।।

আগের দিনে নোয়াখালীর সম্ভ্রান্ত লোকেরাই জুতা পরতেন। সাধারণ লোক কদাচিৎ জুতা ব্যবহার করতো। যারা শুধু উৎসাহী তারা পরতো

চটি জুতা। এখন স্যান্ডেল ও রবার জুতাই প্রায় শতকরা নব্বই জনলোকের পায়ে দেখা যায়। জুতা ও নোয়াখালীর ধাঁধা নিজের স্থান করে নিয়েছে :

লাপাই লাপাই গোঁড়া যায়
হাঁনি দেইলে চোম্‌কি[৯৬] খাড়ায় ॥

সেকালে ভদ্রলোকেরা পরতেন জামা-কামিজ; সাধারণ লোক উদোম গায়ে চলা-ফেরা করতো। নোয়াখালীর ধাঁধায় আছে :

আতা[৯৭] আছে মাতা নাই
হেট[৯৮] আছে উজুড়ি[৯৯] নাই ॥

অথবা

আতা আছে ঠ্যাং নাই
হেট আছে উজুড়ি নাই ॥

মৃৎশিল্পে নোয়াখালীর কুমোরেরা বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। তাদের তৈরী মাটির কলসি গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে। এ জেলায় মাটির কলস আপামর সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ধাঁধা এর সাক্ষ্য দেয় :

হোঁদে ঠেলে মুঁয়ে খায়
হেট হুরাই বাইত যায়[১০০] ॥

অথবা

লাল মিঁয়া আঁড়ো[১০১] যায়
বিনা দোষে থাবড় খায় ॥

অথবা

গোঁড়ি চাবি দোরি
কাইত করি বোরি
মাজায় মাজায় এত্তর করি
বাইত[১০২] দিগে যায় চলি ॥

প্রবাদ প্রবচনেও নোয়াখালীর শিল্প ও শিল্পী জীবনের কিছু কিছু পরিচয় বিধৃত রয়েছে। এখানকার বস্ত্রশিল্প হয়মান কাল থেকে যাদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে তাদের সাধারণ পরিচয় যুগী। এরা গর্তের ভেতর দুপা ঢুকিয়ে

তাঁত চালিয়ে বস্ত্র তৈরী করে। এদের কাজের ঘড়ি বাঁধা কোনো সময় নেই। সকাল-বিকাল অবিরাম খটাখট শব্দ করে তাঁত চালিয়ে এরা বস্ত্র বয়ন করে। বস্ত্রশিল্পীদের এ-পরিচয় দিতে যেয়ে প্রবাদ-প্রবচনে স্মরণাতীত কাল থেকে বলা হচ্ছে :

খাদের যুগী বনের হিয়াল
হেতার আবার বেঁন[১০৩] আর বিয়াল[১০৪]।

দারিদ্রলাঞ্ছিত নোয়াখালীবাসীর সামর্থ্য না থাকলেও সাধের অন্ত নেই। তাদের সে বুকভরা অর্থহীন সাধ আত্মপ্রকাশ করে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনায়। হাতে টাকা না থাকলেও তার গৃহনির্মাণ-শিল্পে উন্নত রুচির পরিচয় দিতে যেয়ে অনেক সময়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের এ অবিমৃষ্যতার পরিচয় বহন করে করে প্রবচন—

ইট কাট বিদে বড়ডা গরের[১০৫] আশা

কিন্তু যারা গৃহনির্মাণ-শিল্পী তারা অনেক সময়েই গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই চিরন্তন বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে নিম্নের প্রবাদে :

ছৈয়ালের বাঁঙা[১০৬] ঘর
কবিরাজের নিত্য জ্বর ।।

নোয়াখালীর মানুষ পরিবেশ আর অবস্থার পরিবর্তনের দরুণও নিজের সহজাত প্রবণতাকে বিসর্জন দিতে পারে না। প্রবাদ আছে—

ঢেঁই বিস্তে গেলেও বারা বাঁদে[১০৭]।।

এ প্রবাদটি অবশ্য সর্ববঙ্গীয়।

মানুষ শত অকর্মণ্য হলেও নিজের অক্ষমতাকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। মানব-চরিত্রের এ দুর্বলতা চিরন্তন। এ দুর্বলতা ঢাকতে যেয়ে মানুষ তার সহকর্মী বা কাজের উপকরণের উপর অবলীলায় দোষ চাপায়। নোয়াখালীর মানুষের এ দুর্বলতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে যেয়ে প্রবাদ বলে—

নাইচতো ন্য জাঁইনলে[১০৮]
উডান বেঁয়া[১০৯] ।।

উল্লেখ্য, এই প্রবাদটি শুধু নোয়াখালীরই নয় সর্ববঙ্গীয় এবং সর্বদেশীয়।

জন-জীবনের একটা মস্ত বড় দুর্ভোগ এই যে, যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব অকাতরে বিসর্জন দিয়ে জনগণের জন্যে মহৎ কিছু গড়ে তোলেন, অকৃতজ্ঞ মানুষ পরক্ষণেই তাঁকে ভুলে যায়। এমনকি উপকারীর অপকার করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। প্রবাদে আছে—

না[১১০] গড়ি দিলে
বাড়ি[১১১] অ হালা ॥

শিল্প সাধনায় অন্য নাম সৌন্দর্যের সাধনা। প্রবাদ বলে—

হাজাইলে[১১২] হাড়াইলে অয় তিরি
কাম[১১৩] গাইজ কৈল্যে অয় গিরি[১১৪] ॥

গৃহ নির্মাণ শিল্পের নৈপুণ্যের সাথে নোয়াখালীর মানুষ অপূর্ব রুচিজ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করে। যেন-তেন প্রকারেই একটা কুটির নির্মাণ করে মাথা গুঁজে থাকতে পারলেই তারা ধন্য হয় না, তারা চায় ঘরের আলো-বাতাস, চায় স্বাস্থ্যপ্রদ ও রুচিসম্মত পরিবেশ। তারা বিশ্বাস করে—

দৈন দুয়ারি গরের রাজা
হুব[১১৫] দুয়ারি তাহার প্রজা
হোচ্ছুম[১১৬] দুয়ারি ছাগল
উত্তর দুয়ারি হাগল[১১৭]।

যে কোন শিল্পকর্মে নোয়াখালীর মানুষ গভীর মনোযোগের মূল্য দেয় অত্যন্ত বেশী।

হাজু গড়ন মন দি
নিরুক্ষি চাঅন চোকদি।

কোনো জিনিস গড়লেই হয় না, তার মধ্যে শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পুরোপুরি পরিস্ফুট করে তুলতে হবে। এমন করে গড়তে হবে যেন তার খ্যাতি রাজ-দরবারে হানা দিতে পারে। নোয়াখালীর মানুষ বিশ্বাস করে-

জীনিস গড়ন হরান[১১৮] দি
রাজায় বোলান জোল্‌দি[১১৯] ॥

এমন কি নোয়াখালীর ছড়াতেও শিল্পসম্মত মনোভাব ফুটে উঠেছে। এখানকার নারীর মনে শিল্প-সুন্দর অলংকারের লোভ দুর্নিবার ; অলংকারের জন্যে তারা যে কোনো কাজ করতে উৎসাহ পায়; অনেক সময় ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। মা শিশুকে ঘুম পাড়াতে যেয়ে বলেন :

ও লেদী[১২০] কাঁদিছ না
বক্কায়[১২১] দোরি নিবো
তোর বাবা বড় মিয়া
হার গড়াই দিবো ।।

কৃপণ শ্বশুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে নিজের অলংকারের বাসনা চরিতার্থ হবে না জেনে গৃহস্থ বধূ ছড়ার মাধ্যমে কামনা করে বৃদ্ধ কৃপণ শ্বশুরের মৃত্যু এবং নিজ আকাঙ্ক্ষার নিরঙ্কুশ নিবৃত্তি। ছড়ায় আছে :

আল্লায় যদি করে বুড়ইয়া যদি মরে
খন্তা বাঁড়ি[১২২] নথ গড়াইউম নাকে যত দরে ।।

নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ পালাগান 'চৌধুরীর লড়াইতে' শিল্পপ্রভাবিত নোয়াখালীর লোক-চরিত্রের এ বিশেষ দিকটা ফুটিয়ে তুলতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। নিবিড় অরণ্যে এখানকার মানুষ নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিতে যেয়ে রাজপুরী নির্মাণ করে।

চৌধুরী ছিল রাজিনারান রাজ্যের অধিকারী।
সিন্দুর কাইতের জঙ্গলা কাটি বান্দিল রাজবাড়ী ।।
[মোহাম্মদ ফরিদ, চৌধুরীর লড়াই, পৃ. ২]

নারীর শিল্পসম্মত আবরণ ও আভরণের বর্ণনা দিতে যেয়ে কবি গেয়েছেন:

মেম ডোম্বরের সাড়ি জরির অঞ্চল।
কাচা সোনা খোপায় জেন করে ঝলমল ।।
বান্দিল মোহন চুড়া জাদের খোবনী।
মস্তকের চুড়া-বেড়ী রয়েছে নাগিনী ।।
[ঐ, পৃ. ৫]

মনের সুখ আর অলংকারের শখের নিকট-সম্পর্ক বর্ণনায় কবি মানব-মনের বিচিত্র অনুভূতিকে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি বলেন :

বিষ বিষ লাগে কন্যার অষ্ট অলঙ্কার।
বিষ বিষ লাগে কন্যার গজমতি হার ॥
[চৌধুরীর লড়াই, পৃ. ১১]

নোয়াখালীর নারীরা তাদের হস্তশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বিচিত্র সুন্দর পাটিতে শিল্প-জ্ঞানের স্বাক্ষর রাখে। সে সব পাটির নামকরণেও তাদের সুরুচির পরিচয় মেলে :

শুন শুন মহারাজ কই তোমার ঠাঁই।
বিছাইছে আমরাঙ্গা পাটি শীঘ্র বস যাই ॥
[ঐ, পৃ. ২২]

এখানকার সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা নিজেদের ঘর-বাড়ীতে কিরূপ শিল্প-সম্মত রুচির পরিচয় দেয়, আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী সমূহ কিভাবে বিন্যস্ত করে তার পরিচয় দিতে যেয়ে কবি লিখেছেন :

দলান কোঠা চৌদেউড়ী কৈল্ল ফুলের ঝাড়।
আনা দিয়া লাগাইল সে ঘরের কেয়াড় ॥
জল টাঙ্গি ফুল টাঙ্গি চৌধুরী উঠাইল।
নানা রঙ্গের ঘর-দরজা তোলাইতে লাগিল ॥
[ঐ, পৃ. ২৬]

বিভিন্ন রকমের খাট-পালঙ্ক, শিল্পসম্মত পাদুকা নোয়াখালীর নরনারীর উন্নত রুচির পরিচয় বহন করে। তাদের মানসিক প্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে 'চৌধুরীর লাড়াই' :

ছপ্পর খাটেতে রঙ্গে শুইয়া নিদ্রা যায়।"
[পৃ. ৭২]

জরির জুতা পায়ে দিয়া বাহিরে আসিল।"
[পৃ. ১৯]

জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও গড় নির্মাণের কৌশলেও নোয়াখালীর অধিবাসীরা বাংলাদেশে খ্যাতনামা ছিল :

কারীগর আসিয়া কোন কম্ম করিল :
সাতখানা বিলাতি জাহাজ তৈয়ার করিল ।।
[চৌধুরীর লড়াই, পৃ. ৭১]

তোরে বলে রামা দাদা কহি তোর ঠাঁই ।
দিঘীর দক্ষিণ পাড়ে কিল্লা বান্ধ আই ।।
[পৃ. ৮৮]

ব্যবসা-বাণিজ্য

নোয়াখালীর মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর সন্ধান করেছে। আজও তারা ব্যবসা বাণিজ্য শুধু নিজের দেশে নয়, সুদূর বিদেশে যেয়েও চালায়। প্রকৃতির নিরন্তর নিষ্ঠুরতার শিকার; প্রয়োজনীয় চাষের জমির অভাবে বিপর্যস্ত, নোয়াখালীবাসী জীবিকার সন্ধানে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে এখানকার লোক-চরিত্র সুপরিস্ফুট। সেই লোক-চরিত্র নোয়াখালীর লোক-সাহিত্যেও নির্ভুল ছায়া ফেলেছে।

নোয়াখালীর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রাচীন কাল থেকে নিজেদের পেশাগত বাণিজ্য আঁকড়ে রয়েছে। এরা প্রধানতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। বাইরের বিশেষ কোনো ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব নোয়াখালীতে নেই বললেই চলে। এখানকার পেশাগত ব্যবসায়ীরা তাঁতী, যুগী, কামার, কুমার, মিস্ত্রী, স্বর্ণকার, কর্মকার, জেলে প্রভৃতি। গরীব মুসলমানদের কেউ কেউ গরুর দুধ বিক্রি করে খাদ্যের সংস্থান করে। বাঁশ, বেত, হোগলা পাতা, মোস্তাক প্রভৃতি দিয়ে নোয়াখালীর নারী-পুরুষ লাই, ওঁড়া, আনতা, ডোল, চাঁই, টুয়া, পাটি প্রভৃতি তৈরী করে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এ-সব জিনিসের ব্যবসা করে দু পয়সা রোজগার করে। কাঠ-মিস্ত্রীরা খড়ম, বেলন, লাঙল, জোয়াল, পিড়ি, টেবিল, চেয়ার, খাট-পালঙ্ক প্রভৃতি তৈরী করে। এ-সব জিনিসের ব্যবসা করেও অনেকে বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। গরীব মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ধান ভেনে চাল বিক্রি করে।

নোয়াখালীর লোক-সাহিত্যে নোয়াখালীর ব্যবসায়ীদের পরিচয়ের স্বাক্ষর রয়েছে। তাদের ব্যবসার উপকরণ-সমূহও লোক-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

নোয়াখালীর এক শ্রেণীর লোক লাকড়ির ব্যবসা করে। গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে গাছ কেটে তারা জ্বালানি কাঠ শহরে-বন্দরে নিয়ে বিক্রি করে। এদের নিত্যদিনের সঙ্গী কুড়াল ধাঁধায় স্থান পেয়েছে :

ছোট্ট-মোট্ট হোলাগায়[১২৩]
দুদ-বাত খায়

বড়ো বড়ো গাছের লগে
যুদ্দ কৈত্তো যায় ।।

নোয়াখালী নদীমাতৃক জেলা নয়। তবু বরিশাল আর দ্বীপাঞ্চলের সাথে সাংবৎসরিক বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, নৌকার মাধ্যমে। বর্ষকালে এ জেলায় অধিকাংশ বাণিজ্য-সাম্ভার বহন করে নৌকা। ধাঁধায় আছে :

বুয়ে[১২৪] আঁড়ে[১২৫] হেড়ে খায়।
হেট ছরাইয়া বাইত যায় ।।

ঢেঁকি নোয়াখালীর ঘর-গৃহস্থির অপরিহার্য অঙ্গ। অনেকে ধান ভেনে চালের ব্যবসা করে। স্বাভাবিক ভাবেই ঢেঁকি স্থানীয় ধাঁধায় সুস্পষ্ট সাক্ষর রেখেছে :

মাঁমুর বাইর আঁতি
যে যায় মারে এক লাতি ।।

অথবা

নদীর মৈদ্যে রগা দরে।
ঠেঙ দিলে কেঁত করে ।।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিত্যদিন টাকা-পয়সা নাড়া-চাড়া করে। বাণিজ্যক লেন-দেনের এই চিরন্তন মাধ্যমও নোয়াখালীর ধাঁধায় স্থান করে নিয়েছে :

এক. আত নাই ঠেঁঙ নাই দেশো দেশো গুরে
ইয়ার অবাবে[১২৬] মাঁইনস[১২৭] অনাআরে মরে ।।

দুই. চলে কিন্তু আঁড়ে না
কি চিজ[১২৮] বাই কত্ত[১২৯] না ?

দাড়ি-পাল্লা ব্যবসায়ীজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। যে কোনো দোকানে দাড়ি-পাল্লা সসম্মানে রক্ষিত হয়। হিন্দুরা দাড়ি-পাল্লাকে সিন্দুর-চর্চিত করে রাখে এবং দোকান খুলে জোড় হাতে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ধাঁধায় দাড়ি-পাল্লাও মর্যাদা পেয়েছে :

আচাইজ্জ্য[১৩০] এক জিনিস দেই আইছি আঁড়ে
আষ্ট[১৩১] ঠেং দুই আঁড়ু,[১৩২] লেজ আছে হিড়ে ।।

স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র নোয়াখালীর অগণিত বাজার, এ-সব বাজারে হাটবারে বিপুল পরিমাণ লেন-দেন হয়, এই বাজার সম্পর্কে ধাঁধা—

খালের হাড়ে বাগের হাঁড়া[১৩৩]
দান মাড়ছে এক শ' আঁড়া
হলে[১৩৪] দান হায় না[১৩৫]
রাইত অইলে[১৩৬] খায় না ।।

মজলিসী ধাঁধা, ছড়া, ডাক ও খনার বচন, কিংবদন্তী ও লোক-সঙ্গীতে নোয়াখালীর বাণিজ্যিক কেন্দ্র বাজারগুলি সঙ্গোপনে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে। এ দেশের লোক বিশ্বাস করে, সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করে না চললে ব্যবসায় উন্নতি সম্ভব হয় না। নোয়াখালীর মানুষ স্বভাবতই ধর্মভীরু এবং ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পাড়া-প্রতিবেশীর সন্তুষ্টি ও শুভেচ্ছাকে অত্যধিক মূল্য দেয়। তারা বিশ্বাস করে—

নোঁয়া না[১৩৭] বানাই শিন্নী ন্য খাবাই বে' রে[১৩৮] গেলে
লাব অয় না ।

ব্যবসায়ে অসাধুতার স্থান নেই। বাণিজ্যিক লেন-দেনের মধ্যে ফাঁকির অবসর নেই। যারা খরিদ্দারকে ফাঁকি দৈয়, ওজনের কম দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে তারা প্রকারান্তরে নিজেদেরকে ঠকায়। নোয়াখালীর লোক বিশ্বাস করে—

এক. যেই দোয়ানদারের হিলগা[১৩৯] ছোড়ো
হেতার কোয়াল অ ছোড়ো ।।

দুই. হিঁছটানা হাল্লীর দোয়ানদারের
কোয়াল খোলে না ॥

তিন. বাঁইর[১৪০] আরেক নাম হাঁই[১৪১] ॥

নোয়াখালীর ধর্মভীরু মানুষ মনে করে রেজেকের মালেক আল্লাহ্। ব্যবসায় অপরিমিত মূলধন নিয়োগ ও কঠোর পরিশ্রম করেও মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্র খুশীর উপর বাণিজ্যিক উন্নতি পুরো-পুরি নির্ভরশীল। কাজেই অর্থ ও পরিশ্রম ছাড়াও আর একটি জিনিস ব্যবসায় সফলতার জন্য অপরিহার্য। তা হলো আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা।

আল্লার দেঅন[১৪২] বেবসায়[১৪৩] বাসন ॥

এখানকার ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ব্যবসার সুরাহার ব্যবস্থা করে চিরদিন খ্যাতি লাভ করেছে। নোয়াখালীর 'চৌধুরীর লড়াই' নামক পালাগানে জমিদারদের হাট-বাজার প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। রাজেন্দ্র চৌধুরী :

হাট মিলাল ঘাট মিলাইল পল্লি সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জ কাছারি ॥"
[মাহাম্মদ ফরিদ, চৌধুরীর লড়াই, পৃ. ২]

সে কালের মানুষ বাড়িতে সূতার চাষ করতো। চরকায় সেই সূতা কেটে কাপড় তৈরির জন্যে যুগীর বাড়িতে দিয়ে আসতো। যুগী পারিশ্রমিক নিয়ে সেই সুতার কাপড় বুনে গৃহস্থকে দিত। চৌধুরীর লড়াইতে আছে :

কালা যুগীর বাটী গেলাম সুতা বি দিবার তরে।
অপূর্ব সুন্দরী দেখলাম কালা যুগীর ঘরে ॥
[পৃ. ২৯]

ঔষধ ব্যবসায়ী ও চিকিৎসাবিদ বৈদ্যরা নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত পরিচিত মানুষ। এমনি এক বৈদ্য প্রতাপশীল জমিদারের কোপে পড়েছিল। তার প্রাণ নিয়ে পলায়ানের কথা চৌধুরীর লড়াইতে বর্ণিত হয়েছে :-

ধ্যায় আর রমিজ বৈদ্য ফিরি ২ চায়।
আর নিরে পাগলা চৌধুরী আমার লাগ পায় ॥
[পৃ. ২৯]

সেকালের ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ বাড়ীতে বিদেশাগত বাণিজ্য দ্রব্যাদি গোলা করে মওজুদ রাখতো। অনেক সময় ঝড় তুফান ও অগ্নিকাণ্ডে এ-সব পণ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যেতো। আবার কখনো কখনো অত্যাচারি জমিদারের কোপে পড়ে এ-সব জ্বলে পুড়ে ছাই হতো। এমনি এক অত্যাচারের বর্ণনা 'চৌধুরীর লড়াই'তে রয়েছে :

ঘর পুড়িল দুয়ার পুড়িল তারে অধিক নাই।
বাহির বাড়ীর কাপড়ের গোলা পুড়িল কিসের লাই।
পুড়িল পুড়িল কাপড়ের গোলা তারে অধিক নাই॥
তাঁত কামটা পুড়িল আমার ধৈরবার লক্ষ্য নাই॥
[পৃ. ৩৫]

অনেক সময়ে হাটের মালিক যে জিনিসের ব্যবসা করতে হাটে দোকানদার বসায়, দোকানদার নিজের ব্যবসার সুবিধার জন্যে সে জিনিস বেচা-কেনা না করে অন্য পণ্যের ব্যবসা চালিয়ে জমিদারের বিরাগ ভাজন হয়। অনেক ব্যবসায়ী লোকসানের ভয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। এদের সম্পর্কে 'চৌধুরীর লড়াই' পালায় আছে :

সুতার ঘর বসাইয়াছি তারা বেচে মোলা।
বরিশাল তুষ আনিয়াছি পাক্কা নুনের গোলা॥
[পৃ. ৫৫]

অথবা

বেপারী পালাইয়া যদি চইলা যায় ঘরে
ডুবাইয়া সোনার ডিঙা গভীর সাগের॥
[পৃ. ৬৯]

সেকালের ব্যবসা এমন জমজমাট ছিল যে, একজন সামান্য মুদীও একটা সৈন্যবাহিনীর আহার যোগাতে পারতো।

মুদিকে ডাকিয়া কথা কহিতে লাগিল।
ভোজনের জন্যে তারা ধুমধাম লৈল॥
শুন ওহে মুদি দাদা কহি তোমার ঠাঁই।
ইংরেজের সৈন্য দাও জলপান করাই॥

এই কথা মুদি দাদা যখনে শুনিল ।
যতছিল সৈন্যগণ জলপান করাইল ।।
[চৌধুরীর লড়াই, পৃ. ১৬]

নোয়াখালীর প্রবাদ প্রবচনেও নোয়াখালীর ব্যবসায়িক জীবনের পরিচয় রয়েছে। ব্যবসায় অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন প্রবাদ-রচয়িতা। সাধ্যাতীত ঝুঁকিগ্রহণ যে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে ব্যবসায়ী মহলে এর নজীরের অভাব নেই। প্রবাদে আছে :

আশি হারে না
বিরাশি লই ঠেলাঠেলি ।।

ব্যবসায় হিসেব-নিকেশের গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতন থাকার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যারা বেহিসেবী তাদের পরিণতি হয় শোচনীয়। তাদের সম্পর্কে প্রবাদ বলে :

ইসাবে[১৪৪] তরে—বেইসাবে মরে।

ব্যবসায় অতিরিক্ত লোভের স্থান নেই। অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লোভের খেসারত দিতে যেয়ে লাল বাতি জ্বালিয়েছে। নোয়াখালীর জনজীবনে এমন ব্যবসা বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রবাদে আছে :

অতি লোবে[১৪৫] গোডি বাঙে।

অনেক ব্যবসায়ী আবার লোভের বশবর্তী হয়ে পুরাতন ব্যবসা ছেড়ে নতুন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হয়। প্রবাদ বলে,

আইল্যার[১৪৬] আল
জাইল্যার জাল ।।

লোভ-মোহ পরিত্যাগ করে যে ব্যবসা করে কিংবা পিতৃপুরুষের সময় থেকে পরিবারে যে ব্যবসায়িক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার সমাধি রচনা করে নতুন পথে যাত্রা শুরু করতে চায়, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেই নোয়াখালীর জ্ঞান বৃদ্ধরা বলে গিয়েছেন।

যোগাযোগ

নোয়াখালীর যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও নোয়াখালীর লোক-চরিত্রের পরিচয় সুপরিস্ফুট। সেই পরিচয় লোক-সাহিত্যের খোরাক যুগিয়েছে। ঘনবসতি-পূর্ণ এ জেলার দরিদ্র মানুষ নিছক জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দেশ-বিদেশে। অভাবের তাড়নায় অনেককেই নিতান্ত অল্প বয়সে ঘর ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়। 'ঘর ছেড়ে আঙিনা বিদেশ' কথাটি নিছক মিথ্যা বলেই নোয়াখালীবাসী প্রমাণ করেছে। নোয়াখালীর মানুষ জাহাজে নাবিক হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে, শ্রমিক হিসেবে শুধু দেশের শ্রম শিল্পের উন্নয়নেই তারা জীবনপাত করেনি, সুদূর ইংল্যান্ডের শিল্পাঞ্চলে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তারা আজ ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে নোয়াখালীর শ্রমিকেরাই প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

নোয়াখালীতে রেল-লাইন বিস্তারের পূর্বে এখানকার লোক পায়ে হেঁটে কুমিল্লা শহরে যেয়ে মামলা-মোকদ্দমা চালাত। কারণ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে নোয়াখালী একটা স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত লোকেরা ব্যবহার করতেন ঘোড়া, পাল্কি, গরুর গাড়ি আর বর্ষার সময়ে নৌকা। গরীব লোকের একমাত্র বাহন ছিল আল্লাহ্‌র দেওয়া পদযুগল। পাল্কির মধ্যে যে আভিজাত্যের স্পর্শ ছিল তা আজ অতীতে স্বপ্নে পর্যবসিত। তবু সেকালের পাল্কি আজও ধাঁধার ভেতরে বেঁচে আছে :

খাঁচার বিত্‌রে[১৪৭] হেঁচার ছা[১৪৮]
তিন মাতা ছ' হাঁ[১৪৯] ।।

রেল লাইনের পরিবহনকে মূর্ত করে তুলেছে ধাঁধা :

দেশের এই মাত্‌তুন[১৫০]
হেই[১৫১] মাত্‌[১৫২] যায়
গায়ে গায়ে ন্য লাগায় ।

মজলিসী ধাঁধা, লোক-কাহিনী, লোক-সঙ্গীতে নোয়াখালীর যাতায়াত-ব্যবস্থার অনেক লুপ্ত কাহিনী অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে। আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, সে কালের সমুদ্র বেগমগঞ্জ থানার উত্তরাঞ্চল ঘেঁষে প্রবাহিত হতো এবং বিহার থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা।

ইংরেজেরা এ দেশে রেলগাড়ির প্রচলন করলে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। তখন তারা তাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ দেশের জিনিসের সাথে বিদেশের জিনিসের তুলনা করে আনন্দ উপভোগ করতো। হিন্দু বাড়ীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মুসলমানের রান্নার আভিজাত্য এ দেশের মানুষ কয়েক শতাব্দী ধরে দেখেছে :

এঁগ্রাজের[১৫৩] গাঁড়ি
ইন্দুর[১৫৪] বাড়ী
মোছলমানের আঁড়ি[১৫৫]।

এক কালে আগরতলা নোয়াখালীর একান্ত সন্নিকটে দেশীয় রাজ্য হিসেবে মর্যাদা পেতো। সেকালে দরিদ্র জনসাধারণ হাঁটা পথে আগরতলার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে যেয়ে, জঙ্গল সাফ করে, চাষাবাদ করতো। এ-সব দুঃসাহসী মানুষের দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে অলস অকর্মণ্যদের মনে সাড়া জাগালে তারা নিজেদেরকে প্রবোধ দিত এই বলে যে, আগরতলা বহু দূরের পথ। ঘর ছেড়ে সেখানে চলে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তারা নিজেরা বলতো, তাদের শুভানুধ্যায়ীরা বোঝাতো :

কোনাই[১৫৬] আগরতলা
কোনাই উগির তলা[১৫৭]॥

নোয়াখালীর মানুষ অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী। তারা যে কোনো কাজ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে ছেড়ে দিতে চায় না। যারা দেশে পেটের ভাতের জোগাড় করতে পারেনি, তারা চিরদিনের জন্যে, পেট ভরে ভাত খাবার উদ্দেশ্যে আসামের জঙ্গলে, রংপুর-দিনাজপুর-যশোর প্রভৃতি জেলার অনাবাদি অঞ্চলে চলে গিয়েছে। তাদের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল—

খাঅন হেড বোরি[১৫৮]
দাঅন[১৫৯] দেশ ছাড়ি।

তখন গ্রামান্তরে গেলেই তারা প্রতারিত হতো, দুষ্ট লোকের হাতে নাজে নাজেহাল হয়ে যেতো। সে তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেকালে প্রবাদ প্রচলিত হয়।

খেস[১৬০] করণ খেসে
গরু কিনন দেশে ॥

নোয়াখালীর লোক বিশ্বাস করে—

কতা কঅন লেশ রাই,
বিয়া দেঅন খেস চাই।

সেই খেস বা আত্মীয় যতদূরেই হোক না কেন। সেকালে শ্বশুর বাড়ীতে জামাই আসতে অনেক তোড়জোড় করতে হতো, কারণ সেকালের মানুষ বাড়ীর কাছে আত্মীয়তা করা পছন্দ করতো না। কাজেই জামাইকে বহুদূর পথ অতিক্রম করে শ্বশুর বাড়ী খুঁজে নিতে হতো। কালে ভদ্রে জামাই আসলে ছোট ছোট শালা শালীরা ছড়া কাটতো—

মাগো মা জামাই আইছে[১৬১]
বোয়াল মাছের কাঁল্লাত করি জেয়ার[১৬২] আইনছে
দুয়ারো বৈতো হিঁড়া[১৬৩] দিলাম হুতি গেছে
ঠ্যাং[১৬৪] দুইতো হাঁনি[১৬৫] দিছি গিলি খাইছে
হাঁন[১৬৬] কাটতো খরি দিছি আঙুল কাডিছে[১৬৭]
মাত[১৬৮] দিতো তেল দিছি কানে ঢাইলছে
গা মুঁইছতো গামছা দিছি, মাজাত বাঁইনছে[১৬৯]
বডডা গড়ো[১৭০] গোছল কৈত্তো দিছি ডুবি মৈচ্ছে।

ছেলেকে বহু দূরের শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যেতো হলে ছেলের বাপকে সঙ্গে যেতে হতো পথ চিনিয়ে দিতে। কিন্তু ছেলের বাপ কোনো কারণে সঙ্গে যেতে না পারলে ছেলের শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়াই মুস্কিল হতো। এমন পরিস্থিতিতে এ জেলার মেয়েরা গান গায়,

গাঁঙে হাঁছুর[১৭১] দিতে আল্লা
গাঁঙে হাঁছুর দিতে
জাঁমাই বারে নিয়া গেছে হোঁতে[১৭২]
কেরে লই যাইবো জামাইরে
নোয়া হোরের[১৭৩] দেশে
কেরে লই যাইবো জামাইরে
দূরিয়া[১৭৪] হোরের দেশে।

সেকালে নোয়াখালীর যোগাযোগ ব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র অংকন করেছেন 'চৌধুরীর লড়াই' পালাগানের কবি মাহাম্মদ ফরিদ। সেকালে বরিশাল, ঢাকা, আগরতলা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে নোয়াখালীর যোগাযোগ ছিল।

বরিশাল হতে আনে কামরাঙ্গা পাটী।
ঢাকা জিলার খাম আনি ঘরে দিল খুঁটি ॥
[চৌধুরীর লড়াই, পৃ. ২৬]

সেকালে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অশ্বারোহণে যাতায়াত করতেন। জমিদার রাজচন্দ্রও ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করতেন :

টাঙ্গন দৌড়াই মহারাজ করিছে গমন।
কালা যুগীর বাড়ী যাই দিল দরশন ॥
[ঐ, পৃ. ২৯]

তখনকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের প্রধান বাহন ছিল পাল্‌কি। এই পাল্‌কিতে চড়ে কাব্যের নায়ক রাজচন্দ্র দূর-দূরান্ত যাতায়াত করতেন। কবি লিখেছেন :

পাল্‌কী দৌড়াই মহারাজ করিছে গমন।
কল্যানিদি কুঠির কাছে দিল দরশন ॥
সেখান হতে মহারাজ পাল্‌কী ছাড়ি দিল।
দাগনভূয়ার হাটে গিয়া পাল্‌কী উত্তরিল।
তথা হতে মহারাজ করিছে গমন।
বড় ফেনী ঘাটে যাই দিল দরশন ॥
[ঐ, পৃ. ৫৬]

পাল্‌কী দৌড়াই মহারাজ করিছে গমন।
আলাদি নগরে যাই দিল দরশন ।।
[ঐ, পৃ. ৫৯]

হয়তো এই পাল্‌কী আরোহণেই নায়ক ঢাকাতেও গিয়েছিলেন। দেশে তখন ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্ব। জমিদারেরা নিজেদের ইচ্ছামতো প্রজা শাসন করতো। জমিদারে জমিদারে যুদ্ধ হলে পরাজিত পক্ষ ঢাকায় কোম্পানীর কর্মকর্তার কাছে মেয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়তো।

মাহাম্মদ ফরিদ কহে সভার চরণ।
ঢাকা যায় চন্দ্র চৌধুরী ইংরেজের সদন ॥
[চৌধুরীর লড়াই পৃ. ১৩]

সেকালের জমিদারেরা নিজেদের খেয়াল খুশী মতো স্নানাহার করতো। কখন কোথায় যাবে, কোন্ দিঘিতে গোসল করবে তার ঠিক ছিল না। রাজচন্দ্র বলে,

পাক সাক কর তোমরা এখানে বসিয়া।
চন্দ্রগঞ্জ যাব আমি স্নানের লাগিয়া ॥
[ঐ, পৃ. ১৮]

কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজের অত্যাচার কোথাও বন্ধু ছিল না। কোথাও ইংরেজ সৈন্যের অমঙ্গল হলে স্থানীয় জমিদারের আত্মা ভয়ে খাঁচা ছাড়া হয়ে যেত।

এই মতে রাজচন্দ্র নজর করি চায়।
ইংরেজ লোক কাটা দেখি বলে হায়রে হায় ॥
[ঐ, পৃ. ২১]

পথ ঘাটের অভাবে সেকালের দুর্ধর্ষ জমিদারদের গমনা-গমন ব্যাহত হয়নি কোনো দিন। রাজচন্দ্র চৌধুরী,

দশ হাজার সৈন্য লই করিছে গমন।
কোট বাড়িয়া যাই তারা দিল দরশন ॥
[ঐ, পৃ. ৩৩]

লোকজন লৈয়া করিছে গমন।
আগরতলা রাজ বাড়ী দিল দরধন ॥
[ঐ, পৃ. ৫০]

অবসর বিনোদন

সেকালে অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা নিজ হাতে কোনো কাজ করতো না। আর যারা নিজের হাতে চাষবাস করতো তাদের বছরের মধ্যে প্রায় আট মাসই ছিল অবসর। কাজেই সেই অবসর বিনোদনের উপায় তারা খুঁজে বের করেছিল।

সন্ধ্যায় গ্রামের সম্পন্ন বাড়ীর দহলিজে বসতো পুঁথির আসর। সুললিত কণ্ঠে পুঁথির বিচিত্র ছন্দ ও কাহিনী লীলায়িত হয়ে গভীর রাত্র পর্যন্ত শ্রোতাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। য়ুসুফ-জোলেখা, শিরী-ফরহাদ, লাইলী-মজনু, জঙ্গে-নামা, কাছাছুল আম্বিয়া, সোনাভান, ভেলুয়া সুন্দরী প্রভৃতি পুঁথি সেকালের শ্রোতাবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। বাড়ীর মেয়েরা প্রায় সারা রাত জেগে পুঁথির আসরের নাস্তাপনি জোগাতো, পান-তামাকের ব্যবস্থা করতো। কোনো কোনো সময় পালা গানের আসর বসতো। চৌধুরীর লড়াই অনেকেরই আদ্যোপান্ত মুখস্ত ছিল। এই রোমান্টিক পালাগান গেয়ে অনেকেই শ্রোতদের তাক লাগিয়ে দিত। বিয়ে-শাদীতে কবির লড়াই হতো। দু'জন কবি সারা রাত পরস্পরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে প্রভাতে মিলে যেতো; শ্রোতাবর্গের প্রশংসা কুড়িয়ে, অনেক সময় সোনার পদক লাভ করে ধন্য হয়ে যেতো।

নোয়াখালীর প্রবাদ প্রবচনে মানুষের অবসর-বিনোদন নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য আছে। সে-সব মন্তব্যের মাধ্যমে নোয়াখালীর লোক-জীবনের পরিচয় ফুটে ওঠে। যখন হাতে কাজ থাকে না, পুরুষেরা দূরের মাঠে কাজে ব্যস্ত থাকে, বাড়ীর বৌ কারুর সঙ্গে অবসর বিনোদনের সুযোগ পায়না তখন সে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ঘুমে ঢুলতে থাকে। তার সেই অবসরপূর্ণ ছবি ফুটাতে যেয়ে প্রবাদ বলে :

কাম[১৭৫] নাই বৌর
ঢুলুনি সার।

নির্জন বাড়ীতে, নব-বিবাহিত দম্পতির, অবসর বিনোদন সাতিশয় রোমান্টিক ধরনের। নর-নারীর চিরন্তন সম্পর্ক তখন তাদের মধ্যে অপরিসীম মাধুর্যময় হয়ে ওঠে। সে কথা বর্ণিত হয়েছে প্রবাদে—

কাম নাই হাঁঙুডির
হাই[১৭৬] কোলে করি থায়[১৭৭] ॥

অথবা

আজাইর আ[১৭৮] খাই
গজারইয়া[১৭৯] মারে ॥

আজকাল অবসর বিনোদনের শ্রেষ্ঠতম আড্ডা জমে চায়ের দোকানে। গ্রামের পুরুষেরা অবসর পেলেই চায়ের দোকানে ভীড় জমায়। দুনিয়ার সকল খবর জোগাড় করে এবং কোনো কোনো সময় তাদের মনগড়া খবর তারা সহর্ষে ও সগৌরবে পরিবেশন করে লোকের তাক লাগাতেও চেষ্টা করে। তাই প্রবাদ আছে,

চা দোয়ানো বই গপ্[১৮০] মারন
দুইন্যাইর খবর নিঅসে[১৮১] লঅন ॥

বাস্তবিক চায়ের দোকানে মুহূর্তকালের মধ্যে সারা দুনিয়ার খবর মেলে। মানুষ যখন কাজ করে তখন সেই কাজে সমগ্র মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। কাজ শেষ হলে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে অবসর বিনোদন করে। তখন কঠোর পরিশ্রমের গ্লানি তারা নিঃশেষে মুছে ফেলে। তারা বিশ্বাস করে :-

কাত[১৮২] হাইলে নাইউরির খবর লঅন[১৮৩]।

অনেক সময় অবসর যাপনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। সাধারণতঃ মাঘ মাসের দিকে নোয়াখালীতে মেলা বসে। ফকির দরবেশদের স্মরণে ওরসের মেলা হয়। এ-সব মেলায় অগণিত মানুষ ভীড় জমায় এবং তাদের অবসর বিনোদন করে। সময় কাটবার এ কৌশল নোয়াখালীর লোক-চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তারা বিশ্বাস করে,

মাগ মাঁইয়া[১৮৪] মেলা
সময় কাডানের ঠেলা ॥

অবসর বিনোদনে নোয়াখালীর লোক-চরিত্র এখানকার জনপ্রিয় ছড়াতেও বিধৃত রয়েছে। ছেলে-মেয়েরা অবসর সময়ে অন্যের বাগানে বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু ফলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ পেলে অন্যের গাছের ফল তারা আহরণ করে। কিন্তু নিরুদ্বেগে খেতে পায় না। বৃদ্ধরাও তাদের অবসর মুহূর্ত ফলের পাহারা দিয়ে ব্যয় করে। তারা নির্দয়ভাবে তাড়া করে অনধিকার প্রবেশকারী ছেলে-মেয়েদের। ছড়ায় আছে,

ঝিঁঅ ঝিঁঅ মাগো
হেঁলা[১৮৫] খাইতাম গেলাম গো

কাঁডা হুঁড়ি মৈলাম গো
কাঁড়ায় লইলো শুলানি[১৮৬]
বুড়ইয়ায় লইলো দৌড়ানি ।।

জীবনের একটা বিশেষ সময়ে মায়ের বাপের বাড়ীর মতো প্রিয় স্থান আর নেই। নিজেদের শ্বশুর বাড়ী এসে বাপের শ্বশুর বাড়ীকে অবলুপ্ত করে দেবার পূর্ব পর্যন্ত মামার বাড়ীর মজা অন্যত্র দুর্লভ। ছড়ায় আছে,

তাই তাই তাই
মামুর বাইত যাই
মামুর বাড়ী বড় মজা
কিল ছোবাড় নাই।

অরণ্য, ছড়াটি কেবল নোয়াখালীর নয়, সর্ববঙ্গীয়।

ছেলেবেলার অবসর বিনোদনের জন্যে নানার বাড়ী শ্রেষ্ঠতম স্থান। সেখানে সকল প্রকার মান-অভিমান, আদর-আবদার অব্যাহত গতিতে চলে। নিজের বাড়ীতে কোনো ছেলে-মেয়েই বেপরোয়া চলতে পারে না। কারণ, পিতা-মাতার কড়া শাসনের ভয়ে তাদের মনের পাখা গজাতে পারে না। নানা-নানীর কাছে অবসর বিনোদনের বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় :

ঝিঁয়া গছো টিঁয়ার বাসা
টিঁয়া কয়, টেঁস্ টেঁস্
হৈত্তো[১৮৭] কালে দেই আইছি
নানা নানীর দেস
নানা আছে নানী আছে
চিঁড়া দুকি খায়
ওগগা চিঁড়া বেশ-কম অইলে
দাদার বাইত যায় ।।

অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা আপন মনে গীত গেয়ে জীবন উপভোগ করে। কিন্তু তাদের সে গীত মেয়ে-মহলের প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরে আসে না। নোয়াখালীর মেয়েরা অবসর সময়ে গীত গায় :

আম হাতা চিরল বিরল
　　কাঁডল[১৮৮] হাতায় লেয়া
নামে নামে উডেরে হাঁছন
　　তোগ বিয়ার কতা।
কাড়ের[১৮৯] দোয়ানে উডেরে হাঁছন
　　তোগ বিয়ার কতা।
　　ওরে হাঁছন তোগ বিয়ার কতা
জিনিসের অ-দোয়ানে উডেরে হাঁছন
　　তোগ বিয়ার কতা
ওরে হাঁছন তোগ বিয়ার কতা
গরে বারে দরবারে উডেরে হাঁছন
　　তোগ বিয়ার কতা
ওরে হাঁছন তোগ বিয়ার কতা ।।

ডাক ও খনার বচনের ভিত্তি ভূয়োদর্শনের উপর স্থাপিত। অবসর-বিনোদন সে-সব সাবধানে রচিত বচনেও নিষিদ্ধ নয়। ডাক ও খনার বচন বলে :

হৈরোর[১৯০] লগে মুগ মুশুরী[১৯১]
বাঁইন্যাই[১৯২] কর বাবুগিরি ।।

নোয়াখালীর বিখ্যাত পালাগান 'চৌধুরীর লড়াই'তেও অবসর-বিনোদনে প্রশস্তি রয়েছে। খুড়ার সঙ্গে নারীর জন্যে যে মারাত্মক শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে অধীর হয়ে গড়েছিল নায়ক রাজচন্দ্র। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ খুড়া তেমন দুর্দিনেও তাকে অবসর বিনোদনে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

শুন ২ প্রাণের ভাতিজা কই তোমার ঠাঁই।
শীতল বৈল তলে একটু আরাম কর চাই ।।
　　[চৌধুরীর লড়াই, পৃ. ২৭]

সেকালের জমিদারেরা বিলাস-ব্যসনে অত্যধিক আসক্ত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের অবসর বিনোদনের জন্যে নটীর নৃত্য-গীতের স্থায়ী ব্যবস্থা করতেন। নিজের বাড়ীর সন্নিকটে নট-নটীদের স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ

করে দিতেন এবং প্রয়োজন মতো মাসোহারার ব্যবস্থা করতেন। "চৌধুরীর লড়াই"র কবি গেয়েছেন :

ভাতিজা রাজচন্দ্র আছে বসিয়া নাগর।
ভাবইয়া রঙ্গিনী নাচে গালিচা উপর ॥
যে কালে রাজিনারায়ণ চৌধুরীর গায়ে ছিল বল।
দিঘীর পাড়ে বসাইল যত নটীর দল ॥
[পৃ. ২]

বহু বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করে, অনেক সংগ্রামের অবসানে, বাংলার মানুষ আজ নতুন করে চোখ মেলে তাকাতে যাচ্ছে। কিন্তু একটা আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে এ জাগরণ কোনো দিনই সার্থক হতে পারে না। যে জাতি নিজের ঐতিহ্যকে অবহেলা করে, সে জাতি কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। ঐতিহ্য সচেতন হয়ে যেদিন আমাদের হারানো মণি-মাণিক্য আহরণ করতে সচেষ্ট হব সেদিন থেকেই সূচনা হবে জাতি হিসেবে আমাদের স্বর্ণযুগের।

শব্দার্থ

১ ঢেঁম—টুকরো ;
২ নেঁও—নেয়া ;
৩ আজার—হাজার ;
৪ হেট-পেট ;
৫ উজুড়ি—নাড়ি-ভুঁড়ি ;
৬ মাইজ খাডালো—মাঝ কামরায় ;
৭ রইছে—রয়েছে ;
৮ আঁই,—আমি ;
৯ হিছের—পেছনের ;
১০ গাই—গাভী ;
১১ হাতা-পাতা ;
১২ মাডি—মাটি ;
১৩ মদ্যে—মাঝে ;
১৪ আডে-হাঁটে ;
১৫ হুগুডি—পাছা ;
১৬ হাঁন—পান ;
১৭ হয়দা—পয়দা ;
১৮ হাতালের—পাতালের ;
১৯ হাত—সাত ;
২০ হারা—সারা, তৈরী ;
২১ বদ্দর—ভদ্র ;
২২ হঁতের—পথের ;
২৩ বেকের—সকলের ;
২৪ অইতো—হতে ;
২৫ ছুঁইতো—স্পর্শ করতে ;
২৬ গৌ—গরু, গাভী ;

২৭ আইল্যার—চাষীর ;
২৮ জাইল্যার—জেলের ;
২৯ আগেতাই—পূর্বহতে ;
৩০ বাঁদে—বাঁধে ;
৩১ নানান হাইল—বিবিধ ফসল ;
৩২ হিঁছের—পেছনের ;
৩৩ আল্যো-হালে, চাষে,
৩৪ আঁডেনা—হাঁটে না ;
৩৫ খেঁতে-ক্ষেতে, চাষের জমিনে;
৩৬ হুতে—পুত্রে;
৩৭ বাসা—ভাসা, বন্যা,
৩৮ হোদ্দলার-পুরুষের ;
৩৯ যতুগা-যতগুলো ;
৪০ হোল-কানা ;
৪১ দানি-ফসল কাটার শেষ দিন ;
৪২ দান-ধান, ধান্য ;
৪৩ হাতৃগা-সাতটা ;
৪৪ বাইত-বাড়ীতে ;
৪৫ দুক-দুঃখ ;
৪৬ উজান-মুঁই-সম্মুখে ;
৪৭ দরে-ধরে ;
৪৮ খেঁতের-জমিনের, ক্ষেতের ;
৪৯ বাঁইন-বীজ বুনা ;
৫০ হসল-ফসল ;
৫১ আডিড-হাঁড় ;
৫২ বাইনেলে—বাঁধলে ;
৫৩ উঁন-উঁকুন ;
৫৪ বুড়ইয়াতে—বৃদ্ধ ব্যক্তি ;
৫৫ হাঁঙ্গার—একাধিক বিয়ের ;
৫৬ যাদুরে-আদুরে পুত্র ;
৫৭ হৈসা-পয়সা ;
৫৮ কাইনজোনা-কেঁদোনা ;
৫৯ মাঁমু-মামা ;
৬০ তোঁর-তোমার,
৬১ হায়-পাকে ;
৬২ হাদি-স্বাদ, ইচ্ছে,
৬৩ মতুরা-মথুরা ;
৬৪ কলি-কাইল্যা-আজব জামানার ;
৬৫ দলা-সাদা ;
৬৬ নারা-শুকনো খড়,
৬৭ ছৈলছেরে- চলেছে ;
৬৮ ছেলাই-জাগাই, ঘুম থেকে উঠানো
৬৯ উডান-উঠান ;
৭০ কুড়াইতো—কুড়াতে ;
৭১ বা'য়-বাবায়, পিতায় ;
৭২ অবাব-অভাব ;
৭৩ যেতার-যার ;
৭৪ কুঁইউর-আঁখ ;
৭৫ খেঁতি-চাষ,
৭৬ হোল-ষোল ;
৭৭ হিয়ার-তার, ওর ;
৭৮ ন্য ছয়—চাষ না করে,
৭৯ আল-হাল ;
৮০ হগল-সর্ব্ব ;
৮১ মুয়ে-মুখে ;
৮২ রাঅন—রাখা ;
৮৩ হাত—পাতা ;
৮৪ বাত-ভাত ;
৮৫ মাঁইল্যাম ঠেলা-মারলাম ধাক্কা ;
৮৬ কাই-আটা ;
৮৭ গাঁডার-বাড়ীর সম্মুখ ;
৮৮ মাতা-মাথা ;

৮৯ লতা-হাতা—লতাপাতা ;
৯০ গরো-ঘরে,
৯১ মুঁয়ে—মুখে,
৯২ হাঁনি-পানি ;
৯৩ আজার-হাজার ;
৯৪ মানস-মানুষ ;
৯৫ হার-পার ;
৯৬ চোম্‌কি-চমক ;
৯৭ আতা-হাত ;
৯৮ হেট-পেট ;
৯৯ উজুড়ি-ভুঁড়ী ;
১০০ হেট-পেট ;
১০১ আঁডোঁ-হাটে, বাজারে,
১০২ বাইত—বাড়ীতে ;
১০৩ বেন-সকাল বেলা, প্রভাত ;
১০৪ বিয়াল-বৈকাল ;
১০৫ গরের—ঘরের ;
১০৬ বাঁঙা-ভাঙা ;
১০৭ বাঁদে—ভানে ;
১০৮ ন্যজাঁইনলে—না জানলে ;
১০৯ বেঁয়া-বাঁকা ;
১১০ না-নৌকা ;
১১১ বাড়ি-মেস্তরি, কীারিগর
১১২ হাজাইলে-সাজালে ;
১১৩ কাম-কাজ, কর্ম
১১৪ গিরি—গৃহস্থ ;
১১৫ হুব—পূর্ব ;
১১৬ হোচ্ছুম-পশ্চিম ;
১১৭ হাগল—পাগল
১১৮ হরান-প্রাণ ;
১১৯ জোলদি—দ্রুত, তাড়াতাড়ি
১২০ লেদী-বালিকা ;
১২১ বক্কায়—ঠকে, ভূতে
১২২ বাঁঙি—ভেঙে
১২৩ হোলাগায়—ছেলেটায়
১২৪ বুয়ে-বুকে ;
১২৫ আঁডে-হাটে, চলে
১২৬ অবাবে-অভাবে ;
১২৭ মাঁইনস মানুষ
১২৮ চিজ-জিনিস, দ্রব্য ;
১২৯ কঅ-বল ;
১৩০ আচাজ্জ্য—আশ্চার্য ;
১৩১ আষ্ট—আট
১৩২ আঁডু-হাঁটু
১৩৩ হাঁড়া-পদচিহ্ন
১৩৪ হলে-ফলে ;
১৩৫ হায় না-পাকে ;
১৩৬ অইলে-হইলে ;
১৩৭ নোঁয়া না—নতুন নৌকা ;
১৩৮ বে'ন-ব্যবসায় ;
১৩৯ হিলগা—শিলটা
১৪০ বাঁইর-বাকীর ;
১৪১ হাঁই-ফাঁকি
১৪২ দেঅন-দে'য়া ;
১৪৩ বেবসায়—ব্যবসা-বাণিজ্য ;
১৪৪ ইসাবে—হিসাবে ;
১৪৫ লোবে—লোভে ;
১৪৬ আইল্যার-চাষীর, যে হালচাষ করে ;
১৪৭ বিত্‌রে—ভিতরে ;
১৪৮ ছা-ছানা, বাচ্চা ;
১৪৯ হাঁ-পা, পদ ;
১৫০ মাত্‌তুন-মাথা থেকে ;

১৫১ হেই--সেই ঐ ; ১৫২ মাত্-মাথায় ;
১৫৩ এঁগ্রাজের—ইংরেজের ; ১৫৪ ইন্দুর—হিন্দুর ;
১৫৫ আঁড়ি—হাঁড়ি, পাতিল ; ১৫৬ কোনাই—কোথায়
১৫৭ উগিরতলা-দরমার নীচ ; ১৫৮ বোরি—ভঁরে ;
১৫৯ দাঅন-ধেয়ে যাওয়া পালিয়ে যাওয়া ; ১৬০ খেস-আত্মিয়তা ;
১৬১ আইছে—এসেছে ; ১৬২ জেয়ার—অলঙ্কার
১৬ হিড়া-পিঁড়ি ; ১৬৪ ঠ্যাং-পা, পদ ;
১৬৫ হাঁনি—পানি ; ১৬৬ হাঁন-পান,
১৬৭ কাডিছে—কেটেছে ; ১৬৮ মাত্-মাথায়,
১৬৯ বাঁনছে-বেঁধেছে ; ১৭০ গড়ো-গর্তে, ছোট পুস্করিনী
১৭১ হাঁছুর—সাঁতার ; ১৭২ হোঁতে-স্রোতে ;
১৭৩ হোরের—শ্বশুরের ; ১৭৪ দুরিয়া—দূরের ;
১৭৫ কাম-কাজ ; ১৭৬ হাঁই-দ্বিতীয় পতি ;
১৭৭ থায়—থাকে ; ১৭৮ আজাইর আ-অবসর ;
১৭৯ গজারইয়া-অনর্থ ; ১৮০ গপ্-গল্প ;
১৮১ নিঅসে—নিঃশ্বাসে ; ১৮২ কাত্-সময়, সুযোগ ;
১৮৩ লঅন—লওয়া ; ১৮৪ মাগ-মাইয়া—মাঘ মাসের ;
১৮৫ হেঁলা-পেয়ালা ফল ; ১৮৬ শুলানী-যন্ত্রণা ;
১৮৭ হৈত্তো-অতীত ; ১৮৮ কাঁডল-কাঁঠাল ;
১৮৯ কাড়ের—কাপড়ের ; ১৯০ হৈরোর—সরিষার ;
১৯১ মুশুরী—মুশুরী ডাল ; ১৯২ বাঁইন্যাই—বুনে।